বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা **হালখাতা**

করোনা ভাইরাস ও বাংলাদেশে এর প্রভাব সংখ্যা

১৪তম বর্ষ ২য় ও ৩য় যৌথসংখ্যা, এপ্রিল– সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকাশকাল
জুন ২০২০

প্রধান সম্পাদক
শওকত হোসেন

সম্পাদক
শরমিন নিশাত

ঠিকানা
কক্ষ: ৬০৪, ৬ষ্ঠ তলা (লিফটের ৫)
রোজভিউপ্লাজা
(হাতিরপুল কাঁচাবাজারের বিপরিতে, শরমা হাউজের উপরে)
কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৯ ।
মোবাইল: ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শওকত হোসেন

মূল্য
প্রতি ওয়েব-পেইজ ২/- টাকা হিসেবে

সূচি

প্র ব ন্ধ
করোনা দুনিয়ায় বাংলাদেশ
আ নু মু হা ম্ম দ ০৩
করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র
আ বু ল বা র কা ত ১৯
করোনা ভাইরাস নিয়ে নানান কথামালা
রা হ মা ন চৌ ধু রী ২৭
করোনা, জীবন ও প্রকৃতি / লেলিন চৌধুরী
লে নি ন চৌ ধু রী ৫৫

অ নু বা দ
কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি- কখন? এবং কীভাবে?
জি না কো লা টা / অ নু বা দ আ বু মো হ ম্ম দ ই উ সু ফ ৫৮

স্বা ক্ষা ৎ কা র / অ নু বা দ
করোনার চেয়ে ভয়ংকর বিপদের কথা জানালেন চমস্কি **৬৮**

চি ঠি / অ নু বা দ
ইতালীর ঔপন্যাসিক #ফ্রান্সেশকা_মেলান্দ্রি, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে রোমে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী অবস্থায় বাকী পৃথিবীর প্রতি একটি চিঠি লিখেছেন। **৭২**

প্র ব ন্ধ

করোনা দুনিয়ায় বাংলাদেশ

আ নু মু হা ম্ম দ

২০২০ সালে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি, থেমে গেছে সবকিছু। চোখে দেখা যায় না এ রকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করোনা ভাইরাস দুনিয়াকে একদিকে থামিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে তার চেহারা উদাম করে দিয়েছে। এ রকম সময় মাঝে মাঝে আসে যখন সবকিছু উদাম হয়ে যায়। ট্রিলিয়ন ডলারের যুদ্ধ-অর্থনীতি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মুহূর্তে লক্ষ মানুষ হত্যার সরঞ্জাম সবকিছু নিয়ে বিশ্ব এখন করোনা ভাইরাসের কাছে পুরোই অসহায়। বর্তমান বিশ্ব (অ)ব্যবস্থা মানুষ খুন করতে পরিবেশ বিনাশ করতে যত সম্পদ দরকার দিতে রাজি, মানুষের নিরাপত্তার জন্য তার কোনো মাথাব্যথা নেই, এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিও তুলনায় দুর্বল। সর্বজনের চিকিৎসা অবকাঠামো পুঁজির আঘাতে বহু জায়গাতেই বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে তো এই ব্যবস্থা দাঁড়ায়ইনি। বাণিজ্যিকীকরণে সর্বজনের চিকিৎসা ব্যবস্থা কোণঠাসা। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার নেতা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সম্পদশালী দেশ সারা দুনিয়ায় সামরিক ঘাঁটি চালাচ্ছে, নিজ দেশে হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের চেহারা তাই আরও খোলাসা হচ্ছে এই সময়ে। কোন্ রাষ্ট্র এই সুযোগে আরও নজরদারি বাড়াচ্ছে, বলপ্রয়োগের সংস্থাগুলো গোছাচ্ছে, কোন্ রাষ্ট্র বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বৃহৎ সুবিধা দিতে কিছু রাখছে নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য, কোন্ রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানে সাধ্যমতো মনোযোগ দিচ্ছে, কোন্ রাষ্ট্র আগে থেকেই নাগরিকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ায় এখন নির্ভার হয়ে অন্য দেশের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা-ও পরিষ্কার হচ্ছে।

ফ্রম 'ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম' টু 'করোনা ভাইরাস ক্যাপিটালিজম'

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রধান খুঁটি হচ্ছে চারটি: যুদ্ধ-সমরাস্ত্র, জীবাশ্ম জ্বালানি, আর্থিক খাত এবং কৃষিতে বিষের বাণিজ্য। এই চারটি ক্ষেত্রেই গুরু হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা বিশ্বে সব থেকে পরাক্রমশালী। সারাবিশ্বে যুদ্ধ, গোয়েন্দা নজরদারি এবং পারমাণবিক-রাসায়নিক-জৈব অস্ত্র গবেষণা ও মজুদের যে ভয়ংকর চিত্র তার পেছনে প্রধান শক্তি হচ্ছে এই দেশ। এত পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও করোনা ভাইরাসের আক্রমণে এদেশটি এককভাবে সবচাইতে বেশি বিপর্যস্ত।

লেখক গবেষক সংগঠক নাওমি ক্লেইন কয়েকবছর আগে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিয়ে। এর নাম ছিল 'ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম'। অজানা বিপদ করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বকে অভূতপূর্ব মাত্রায় অস্থির করে তোলার পর লিখেছেন "ফ্রম 'ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম' টু 'করোনা ভাইরাস ক্যাপিটালিজম'"। আসলে বর্তমান উন্নয়ন ধারার সাথে এই দুই-ই গভীরভাবে সম্পর্কিত।

বিশ্বে প্রতিবছর সমরাস্ত্র ক্রয়, তা নিয়ে বিপজ্জনক ব্যয়বহুল গবেষণা, নজরদারি ইত্যাদিতে ব্যয় হয় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার (বা ২ হাজার বিলিয়ন, ১ বিলিয়ন মানে ১শ কোটি) যা বাংলাদেশের বর্তমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রায় ৪০ বছরের মোট বাজেট অর্থের সমান। এর একশো ভাগের একভাগ খরচ করলে সারাবিশ্বের মানুষ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি পেতে পারেন। কিন্তু মানুষ-হত্যা, পরিবেশ বিনাশে যত সম্পদ ব্যয় হয় মানুষ বাঁচাতে তার এক কণাও পাওয়া যায় না। সেজন্য চিকিৎসা-গবেষণাতেও খুবই অপ্রতুল বরাদ্দ। জানা অসুখ নিয়ে গবেষণাও যথেষ্ট নয়। সমরাস্ত্র খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার একাংশ যায় পারমাণবিক, জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে গবেষণায়। সেগুলো বিভিন্ন প্রাণী, সমুদ্র, বায়ুম-লে কী বিষ তৈরি করে তা অনুমান করা শক্ত নয়। শুধু তাই নয় বর্তমান প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন, কতিপয় অঞ্চল ও শ্রেণির অতিভোগ তৈরি করে ভয়ংকর বর্জ্যের পাহাড় যা উৎস হয়ে থাকে বহুরকম রোগের। রাষ্ট্রীয় সীমানা দিয়ে তা ঠেকানো যায় না। সেটাই দেখাচ্ছে করোনা ভাইরাস।

সমরাস্ত্র উৎপাদন, সামরিকীকরণ, যুদ্ধ এবং নজরদারি একদিকে মুনাফা আর ক্ষমতার অন্যতম মাধ্যম, অন্যদিকে এগুলোই হচ্ছে বিশ্বজুড়ে সম্পদ অপচয় ও বর্জ্য উৎপাদনের সবচাইতে বড় এবং বিধ্বংসী উৎস। পারমাণবিক বর্জ্য ভয়াবহ বর্জ্যের পাহাড় তৈরি করছে বিশ্বে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বোমা, ইউরেনিয়ামসহ বিভিন্ন খনিজদ্রব্য উত্তোলন এবং এসব কেন্দ্র করে সামরিক বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে যে বর্জ্য উৎপাদিত হয় তা বিপজ্জনক মাত্রায় পানি, মাটি সহ পরিবেশকে সমাধান অযোগ্য মাত্রায় নষ্ট করছে। প্রাণবৈচিত্র্যের শক্তি বিনষ্ট করে পরিবেশগত ভারসাম্য বিপন্ন করছে। এসব ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অপরাধী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, সরকারি হিসাবেই সেখানে কোটি কোটি টন রেডিও-একটিভ বর্জ্য, ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি মজুত হয়ে আছে। বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক বর্জ্য কীভাবে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় রাখা যাবে কিংবা এগুলোর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে তার কোনো সন্তোষজনক সমাধান এখনও পাওয়া যায়নি। জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে গবেষণার প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তা থেকে দেশে দেশে তৈরি হচ্ছে একেকটি ভয়ংকর বিপদের মজুদ। আর এসব ক্ষেত্রে দুনিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসা-সরঞ্জামের অভাবে মানুষ মরছে। কেননা সর্বজনের চিকিৎসা ব্যবস্থা সেখানে কোম্পানি-স্বার্থ আর যুদ্ধ-অর্থনীতির কাছে কোণঠাসা হয়ে গেছে।

গত কয়েক দশকে যুদ্ধসহ বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিক উৎপাদন ছিল ২০ লাখ টন, ২০১৬ সাল নাগাদ তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টনে। এর মধ্যে ১৩ কোটি টন শেষ পর্যন্ত গিয়ে সমুদ্রে জমা হয়। প্লাস্টিক সামগ্রীর এই উচ্চহারে বৃদ্ধির পেছনে আছে সুপারমার্কেটে সাজানো পণ্যের প্লাস্টিক প্যাকেজিং এবং 'ওয়ান টাইম' সামগ্রীর অনুপাত বৃদ্ধি। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৪০০ কোটি টন। বহু শিল্পোন্নত দেশ এখন রিসাইক্লিং বা পুনরুৎপাদনের জন্য তাদের প্লাস্টিক বর্জ্য প্রান্তিক দেশগুলোতে রপ্তানি করছে। ২০১৭ সালে নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত চীনই ছিল এসব প্লাস্টিক পণ্যের প্রধান ক্রেতা। এখন এসব পণ্যের প্রধান গন্তব্য হচ্ছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বেশিরভাগ প্লাস্টিক পণ্য নদীতে এবং সেই সূত্রে সমুদ্রে গিয়েই জমা হয়। বাংলাদেশসহ এই চারটি দেশকেই এখন সমুদ্রে প্লাস্টিক জমার জন্য প্রথম দশটির মধ্যে গণ্য করা হয়।

এছাড়া দ্রুতগতিতে ইলেক্ট্রনিক পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রতিবছর প্রায় ৫ কোটি টন ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি কম্পিউটার বাতিল করা হয়, ইউরোপে ১০ কোটি ফোন বাতিল হয়। এর ১৫-২০ শতাংশ পুনরুৎপাদনে যায়, বাকি পুরোটাই জমে মাটিতে, পানিতে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের স্থান। চীনে দেশের ভেতরে ই-বর্জ্য তৈরি হয় ৩০ লাখ টনেরও বেশি। এর পরিমাণ বৃদ্ধি শুধু চীন নয় বিশ্বের প্রাণ-প্রকৃতির জন্য হুমকি হয়ে ওঠছে। কেননা এগুলোর বিষাক্ত প্রভাব দেশের সীমানায় আটকে থাকে না।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশের মতো প্রাথমিক পর্যায়ের বর্জ্য নিয়ে ভয়ংকর অব্যবস্থাপনা দেখা যায় না। কিন্তু এসব দেশে পুঁজির আধিপত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পবর্জ্য, পারমাণবিক বর্জ্য, প্লাস্টিক, ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের পাহাড় তৈরি হচ্ছে। এর অনেকগুলোই তারা বিদেশি 'সাহায্য' আর বিদেশি বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে স্থানান্তর করছে বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ দেশগুলোতে। এসব বর্জ্য বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি উন্মাদনা তৈরিতেও সহায়তা করছে।

পুঁজির গতিতে জিডিপি বাড়ছে, ধনীদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, জৌলুস বাড়ছে আর বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব বর্জ্যের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ছে। অপচয় আর প্রাণ-প্রকৃতি-মানুষ বিধ্বংসী তৎপরতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বব্যবস্থার আসল চেহারা। জলবায়ু পরিবর্তনসহ সমুদ্র, নদী মহাবিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্জ্যবান্ধব উন্নয়নে সরকারের একগুঁয়ে উন্মাদনায় বিপদ বাড়ছে আরও বেশি। করোনা ভাইরাস তার একটি।

সম্পদ ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার

বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের সরকারই বলবে-- করোনা মোকাবিলায় যেখানে সবচাইতে পরাক্রমশালী 'উন্নত' দেশ যুক্তরাষ্ট্রই বিপর্যস্ত সেখানে অন্যরা কীভাবে পারবে? আসলে করোনা ভাইরাসের এই ভয়ংকর বৈশ্বিক সংকট আমাদের উন্নয়নের সংজ্ঞা নতুনভাবে ভাবতে চাপ দেয়, চোখ এবং চিন্তার বদ্ধতা কাটানোর পথ দেখায়। দেখায় যে, পেশির জোর, অস্ত্র আর অর্থের দাপট, বহুতল ভবন, জৌলুস থাকা মানেই উন্নয়ন না। কোনো দেশে সম্পদ কম থাকতে পারে, জৌলুস না-থাকতে পারে কিন্তু যদি নাগরিকদের সেদেশে খাদ্য-চিকিৎসা-জীবনের নিরাপত্তা থাকে, সম্মান থাকে, গুরুত্ব থাকে, যদি সেখানে প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষা থাকে তাহলে সেদেশই উন্নত।

মানুষের জগতে রোগ, দুর্যোগ নানামাত্রায় আসতেই পারে। কিন্তু তাতে কোনো দেশের নাগরিকেরা কতটা বিপর্যস্ত হবেন তা নির্ভর করে ওই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন দর্শন দ্বারা পরিচালিত, কী এবং কারা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তার উপর। বেশি সম্পদ, কম সম্পদ যে নির্ধারক নয় তা করোনা বিপর্যয়কালে মহা পরাক্রমশালী যুক্তরাষ্ট্র আর ক্ষুদ্র কিউবার অবস্থা তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়। এত কম সম্পদ নিয়েও কিউবা তার প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তারা করোনা সহায়তার জন্য ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার বাইশটি দেশে ডাক্তার ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। অথচ বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির শিকার। কেন? কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ ও সক্ষমতা তার নাগরিকদের চাইতে বেশি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির জন্য, সাম্রাজ্যবাদ ব্যবস্থাপনার জন্য, যুদ্ধের জন্য, ধ্বংসের জন্য। করোনাকালেও ট্রাম্প গর্ব করে বলেন, 'আমাদের সামরিক বাহিনী বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', বলতে পারেন না যে, 'আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

তাই নিউইয়র্ক বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক শহর হলেও সেখানে দারিদ্র্য কেন্দ্রীভূত, আর করোনায় তাদের মধ্যেই বেশি অকালমৃত্যু। যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু চিকিৎসা-ব্যয় পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি হলেও মুনাফামুখী ব্যক্তি-ব্যবসা, বৃহৎ বীমা ও ওষুধ কোম্পানিগুলোই তার বড় অংশ খেয়ে ফেলে। মার্কিন তথ্যচিত্র নির্মাতা মাইকেল মুরের *সিকো* এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে বিস্তৃতভাবে। ব্যবস্থাটাই এমন যে, স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশাল ব্যয় হলেও সে-দেশে কয়েক কোটি নাগরিকের চিকিৎসা-নিরাপত্তা নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা, চিকিৎসা গবেষণা কতিপয় গোষ্ঠীর মুনাফাবৃদ্ধির লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত। ফলে পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় অস্ত্র যোগান দেয়া তাদের জন্য হাতের তুড়ি হলেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী, গবেষণা অপ্রতুল। ডাকাতি করে নিয়ে আসতে হয় চিকিৎসা সরঞ্জাম; ভেন্টিলেটর-আইসিইউ যথেষ্ট নেই, ডাক্তারদের সুরক্ষা সরঞ্জামের অভাব। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে সারা পৃথিবী ক্ষত-বিক্ষত, একই প্রক্রিয়ায় যে সেদেশের নাগরিকেরাও জীবন ও জীবিকায় বিপর্যস্ত করোনা তাই আরও স্পষ্ট করেছে।

বিপরীতে কিউবা গত ছয় দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক আগ্রাসন ও অবরোধের মধ্যে টিকে থাকতে লড়াই করছে। শক্তি-সামর্থ্য, অর্থনীতির আকার, সম্পদ কোনোদিক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এর কোনো তুলনা হয় না। সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশের চাইতেও দুর্বল এই দেশ। অথচ এরকম প্রবল চাপে থেকেও দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে রাষ্ট্র– দুধ-ডিমসহ প্রয়োজনীয় খাবার, আশ্রয় এবং সর্বোত্তম চিকিৎসা। যার ফলে কিউবার নাগরিকরা প্রথম থেকেই একটা নিরাপদ অবস্থানে থাকতে পারছেন। তাদের খাদ্যের ও আশ্রয়ের সমস্যা নেই, স্বাস্থ্যসেবা খাত অনেক শক্তিশালী, সেজন্য শারীরিকভাবে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক বেশি। কিউবার সাথে চীন এবং ভিয়েতনামের তফাৎ হল, শেষের দুই দেশে বেশ কিছু বাজারমুখী সংস্কার, প্রাইভেটাইজেশন হয়েছে। তাদের সর্বজন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা থাকলেও সকল নাগরিকের জন্য কিউবার মতো খাদ্য ও চিকিৎসার নিশ্চিত ব্যবস্থা এখন আর নাই। তবে ভিয়েতনামের শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কারণে খুব দ্রুত তারা করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। এর বাইরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার কারণে এশিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ভালো করেছে। একইসাথে সফল মোকাবিলার জন্য ভারতের রাজ্য কেরালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রিভবন, সম্পদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হলেও ইউরোপের বেশ কিছু দেশে সর্বজন-শিক্ষা ও সর্বজন-স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা আমরা জানি। এগুলো সম্ভব হয়েছিল সেসব দেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রভাবে। এই শর্ত দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ৮০ দশক থেকে যেসব দেশ স্বাস্থ্য শিক্ষার বাজারমুখী সংস্কারের দিকে গেছে সেখানেই পরিস্থিতি জনবৈরী হয়েছে। ব্রিটেনে করোনাকালে বিপর্যয় তার অন্যতম উদাহরণ। ইতালিও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক ব্যয়হ্রাসের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা: অসুখ তৈরির কারখানা

বাংলাদেশে উন্নয়ন ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তা অদূরদর্শী, ব্যক্তি-মুনাফাকেন্দ্রিক, পরিবেশ বিধ্বংসী এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে অন্ধ। বর্তমান পর্যায়ে বাংলাদেশে শিল্পবর্জ্য ও মেডিক্যাল বর্জ্য প্রধান হুমকি, এর সাথে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের বাজারের অনুসঙ্গ ক্রমবর্ধমান পরিমাণে প্লাস্টিক ও পলিথিন। এর প্রধান শিকার নদী ও জলাভূমি, সেই সঙ্গে বাতাস। গত দুদশকে বাংলাদেশে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ হয়েছে। বাংলাদেশে কম-বেশি ৩০ হাজার ছোট-বড় কারখানা আছে। এসব কারখানার অনেকগুলোই ৪০টিরও বেশি ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। গার্মেন্টস ছাড়াও ওষুধ, রসায়ন, প্লাস্টিক, জুতা, সিমেন্ট, সিরামিকস, ইলেকট্রনিকস, খাদ্যসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিনিয়োগ হয়েছে।

আমরা সবাই জানি যে, এসব শিল্পের অধিকাংশের বিকাশ যথাযথ নিয়ম মেনে হয়নি। কারখানা করতে গিয়ে বন উজাড় হয়েছে, জলাভূমি ভরাট হয়েছে, কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাও যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কারখানা-বর্জ্য অবাধে নদী-নালা খালবিল দূষণ করছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরে অবস্থা সবচাইতে খারাপ। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী সবই বর্জ্যের গন্তব্য। বুড়িগঙ্গা নর্দমায় পরিণত হয়েছে, অন্য অনেক নদীও সেই পথে। শ্রমিক-মজুরি, জীবন ও কাজের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ কোনো কিছুই ন্যূনতম মানে পৌঁছাতে পারেনি। কারখানার দূষণ কমানোর জন্য অপরিহার্য ইটিপি বসানো বা চালু রাখার কোনো আগ্রহ নেই কারখানা মালিকদের। গড়ে উঠেছে অনেক অবৈধ কারখানা, কিংবা বৈধ কারখানার অবৈধ তৎপরতা। আবাসিক এলাকায় মজুদ করা হচ্ছে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, অবৈধভাবে চলছে প্লাস্টিক, ফ্যান সহ নানা কারখানা। দেশজুড়ে ইটের ভাটা, বেশিরভাগই অবৈধ। সেইসাথে চলছে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ-অব্যবস্থাপনা।

এগুলোর কারণে ঢাকার বাতাস এখন বিশ্বে সবচাইতে বেশি দূষণের রেকর্ড করেছে। পানি ও বায়ুদূষণ এসব অনিয়ন্ত্রিত 'উন্নয়ন' তৎপরতার অন্যতম পরিণতি। ডেঙ্গু, শ্বাসকষ্ট, কিডনি-ফুসফুস-হৃদযন্ত্র জটিলতা সহ নানা অসুখ মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত, দুর্বিষহ করে তুলছে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে মানুষের। তাই করোনা ছাড়াই দেশের অসংখ্য মানুষ অকালমৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে দিন পার করছেন। সরকার এর সাথে বিপুল উৎসাহে একের পর এক কয়লা আর পারমাণবিক প্রকল্প করছে যার ভয়ংকর পরিণতি চিন্তা করাও কঠিন। সুন্দরবন বিনাশেও সরকারের একগুঁয়েমি চলছে। প্রাথমিক বর্জ্য-ব্যবস্থাপনায় ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতা থাকলেও আরও ভয়াবহ বর্জ্য-বান্ধব কয়লা ও পারমাণবিক কেন্দ্র ভিত্তিক 'উন্নয়নের' পথে যেতে তার কোনো দ্বিধা নেই।

তাই উন্নয়নের মহাসড়কের গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত হলেও আমরা দেখছি সর্বজন হাসপাতালে দুরবস্থা, সরঞ্জাম নেই, বাজেট নেই, পর্যাপ্ত শয্যা নেই, আইসিইউ হাতেগোনা। বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরছে।

বাংলাদেশে করোনা: চিকিৎসা ও খাদ্যসংকট

১৬ কোটি মানুষের বাস এই বাংলাদেশে। কিন্তু ভাইরাসের পরীক্ষা হয়েছে খুব ধীরগতিতে, প্রথম দিকে খুবই কম ছিল, এখন সর্বোচ্চ দিনে ১২ হাজারে পৌঁছেছে। শোনা যায় পরীক্ষা করার সক্ষমতা আছে ৩০ হাজার। পরীক্ষায় সরকারের আগ্রহ কম। সেজন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র র‍্যাপিড টেস্ট নিয়ে অগ্রসর হলেও সরকার হয়তো সেকারণেই বিষয়টি অনুমোদন দিতে গড়িমসি করছে। একজনে ফেসবুক মন্তব্যে সঠিকভাবেই লিখেছেন, 'স্কুলে পরীক্ষা না হলে তো আর কেউ ফেল করে না। বাংলাদেশের সেই দশা।'

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একাধিক খবরে শুধু নয় নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখছি, অনেকে লক্ষণ নিয়ে দিনের পর দিন চেষ্টা করেও টেস্ট করার সুযোগ পাচ্ছেন না। করোনা- লক্ষণ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা যে বাড়ছে তার কিছু নমুনা প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় দেখা যাচ্ছে। লক্ষণ আছে কিন্তু সনাক্ত হয়নি, এরকম একটি ক্ষেত্রেও যদি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে এর সূত্রে কতজন বিপদ-আক্রান্ত হতে পারেন তা চিন্তা করাও কঠিন। এই চিকিৎসায় ডাক্তার-নার্সদের ঝুঁকি সবচাইতে বেশি, কিন্তু তাদেরও সুরক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল। সরকার সমর্থক ডাক্তাররা পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব সামগ্রী নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে খুব কম। এখন দেশে সরকারের বাইরে অনেকে উদ্যোগ নিচ্ছেন, চীন থেকে আমদানি হচ্ছে। এসব সামগ্রীতেও ভেজাল-প্রতারণার খবর বাড়ছে।

জানুয়ারি মাস থেকে এই অজানা ভাইরাসের বিপদ নিয়ে বিশ্বজুড়ে কথাবার্তা হলেও বাংলাদেশে সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। বেশি আক্রান্ত দেশগুলো থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য কোয়ারেন্টাইন, রোগীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল, আইসিইউ প্রস্তুত করা এগুলো খুবই অগোছালো ও সমন্বয়হীন ছিল । বরং প্রথম থেকেই সমস্যাটি অস্বীকার করার প্রবণতা এবং সরকারের মন্ত্রীদের হাস্যকর আত্মপ্রসাদের বাণীর কারণে যতটা প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিল সেই কাজের গতিও মন্থর হয়েছে। এই দুর্বলতা প্রকট হবার কারণে যখন প্রয়োজন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তখন তথ্য চেপে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা, ভয়ভীতি দেখানোর ক্ষেত্রে বরং সরকারের সক্রিয়তা আরও বেশি দেখা গেছে।

দুনিয়া জুড়ে করোনা ভাইরাস ছড়াবার প্রাথমিক সময় জানুয়ারি মাস থেকেই সরকারি বক্তব্য শুনেছি যে, করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আড়াই মাস পরেও দেখা গেছে দেশের বড় বড় হাসপাতালেই এসব রোগী আলাদা করে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। ডাক্তার-নার্সদের সুরক্ষা পোশাক নেই।

রোগ পরীক্ষার কিট নেই। মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে পরীক্ষা কিট, সুরক্ষা পোশাক বিদেশ থেকে আসতে শুরু করেছে। দেশের মধ্যেও এগুলো তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ দেখা গেছে। তবে রোগ পরীক্ষা খুব সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত থেকেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বলছে ব্যাপক সংখ্যায় পরীক্ষা করতে, কারণ পরীক্ষা না করলে তো বোঝাও যাবে না, ব্যবস্থাও নেয়া যাবে না। সেখানেই বাংলাদেশের বড় ঘাটতি। পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। এখন পরিস্থিতি এমন যে, অন্যান্য অসুখেও রোগীদের চিকিৎসা পাওয়া এখন খুবই দুরূহ।

চিকিৎসা-সংকটের পাশাপাশি ভয়াবহভাবে তৈরি হয়েছে কর্মহীনতা ও অনাহারের সংকট। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি ঘোষণায় বন্ধ হয়েছে ১৭ মার্চ থেকে। আরও বহু প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম তখন থেকেই সীমিত করে ফেলা হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে চলাচল কমে যায়। পরিবহন শ্রমিক, দোকান শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, হকারসহ ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা বেকার হয়ে পড়েন। ২৬ মার্চ থেকে কারখানা ও সীমিতভাবে ব্যাংক বাদে সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাস, লঞ্চ, ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার মুখে লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষ গ্রামের দিকে রওনা হন। গ্রামে না গিয়ে তাঁরা কী করবেন? ঢাকায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা এমন নয় যে, তাতে করোনা থেকে বাঁচার মতো করে থাকা যাবে। ঢাকায় থাকলে শরীর অসুস্থ হলে যে চিকিৎসা হবে তা-ও নয়, ঢাকায় থাকলে যে খাবারের সংস্থান হবে তা-ও নয়। তাহলে কেন ঢাকায় থাকবেন তাঁরা? যারা থেকে গেলেন ঢাকায় তাদের রাস্তায় চলাচল করতে হয়, দোকান বা হাসপাতাল বা কাঁচাবাজারে যেতে হয়। কিন্তু প্রথমদিকে নির্বিচারে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করতে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তৎপরতা ছিল আক্রমণাত্মক। তাদের আক্রমণের শিকার হন বৃদ্ধ ভ্যানচালক থেকে তরুণ ডাক্তার পর্যন্ত। সরকার-বেসরকার থেকে বেতার-টেলিভিশনে লিফলেটে-মাইকে বলা হতে থাকে সবাইকে ঘরে থাকতে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় বহু মানুষের বাসস্থান এমন সব স্থানে, রাস্তায়, রেললাইনের ধারে, বস্তিতে যেখানে তারা কীভাবে এসব শর্ত পূরণ করবে তার কোনো নির্দেশনা সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই আসেনি। বা সরকারি দল ও অগণিত শাখা-সংগঠনের এত এত লোকজন তাদেরও কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন কেমন, কেমন তার থাকা, খাওয়া, খেলা, কাজ আর রাষ্ট্রের বা সর্বজনের অর্থ কোথায় যায় তা নিয়ে ফেসবুকে গবেষক মাহা মির্জা যা লিখেছেন তাতেই সারকথা পাওয়া যায়:

" কুড়িল বস্তির কথা মনে পড়লো। খালের পাড়ে সারি সারি বাঁশের ঘর। ওইটুকু জায়গায় কত মানুষ রোজ ঢোকে, বের হয়। গায়ে গা লাগিয়ে মানুষ বাঁচে। ডাম্প করা ময়লার স্তূপে বাচ্চারা খেলে। আরবান এলিটদের নাক সিঁটকানি দেখি আর অবাক হই। তারা উপদেশ দেয়, এই জাতি নোংরা, খারাপ, থুথু ফেলার হ্যাবিট। মানলাম। কিন্তু থুথুর মধ্যে, কফের মধ্যে, আপনার ইউরেনাল লাইনের উপরে, খোলা পায়খানার কয়েক গজের মধ্যে একটা মধ্য আয়ের দেশের কত লক্ষ মানুষ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় বলেন তো? এলিয়েন তো নয়, আপনারই সার্ভিস প্রোভাইডার। আপনার ঠিকা বুয়া, সিঁড়ি মোছার বুয়া, সকালবেলার হকার। প্রতিদিন আলু-টমেটো সরবরাহ করা ভ্যানওয়ালা। আপনার প্লাম্বার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ডিশের লাইন ঠিক করতে আসা অল্পবয়সী ছেলেটা? কই থাকে? গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস দেয়া এতগুলো মানুষ কেন এমন গায়ে গা লাগিয়ে ইতরের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, এই প্রশ্নটা করেন না কেন? কারণ এই প্রশ্নটা করলে সিস্টেমে ধাক্কা লাগবে। আপনার পোষাবে না। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা করেন-না কেন, সামিট গ্রুপকে বসিয়ে বসিয়ে ২ হাজার কোটি টাকার বিল দেয়া যায়, এস-আলম গ্রুপকে তিন হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মওকুফ করে দেয়া যায়, কিন্তু সারাবছর হাড়ভাঙা খাটুনি খাটা গার্মেন্টসের মেয়েগুলোকে স্ববেতনে ছুটি দেয়া যায় না কেন? প্রশ্ন করেন তো, ঢাকা-মাওয়া রুটের নির্মাণকাজে ইউরোপের ৩ গুণ বেশি খরচ হয়ে যায়, অথচ একটা আইসিউ বেডের জন্যে, একটা ভেন্টিলেটরের জন্যে প্রতিদিন শত শত মানুষ এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে পাগলের মতো ছোটে কেন? বিশ্বের সর্বোচ্চ খরচের ফ্লাইওভারের দেশে প্রতি ১০০০ জন রোগীর জন্যে মাত্র ১টা হাসপাতাল বেড কেন? আমরা মজুদ করেছিলাম

কম্যাট ফাইটার্স, এয়ার মিসাইল সিস্টেম, মিগ ২৯। এখন আমাদের ফ্রন্টলাইনের চিকিৎসকরা হাহাকার করছে, মাস্ক নাই, কিট নাই, বেড নাই, আইসিইউ নাই। প্রায় দুই মাসের মতো অমূল্য সময় পাওয়ার পরেও আমাদের হাসপাতালগুলো আনপ্রোটেক্টেড কেন? প্রয়োজনীয় গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার, আর টেস্টিং কিট মজুদ করা গেল না কেন? প্রশ্ন করেন তো, রাশিয়ার সঙ্গে আট হাজার কোটি টাকার আর্মস ডিল করা যায়, বেসরকারি বিদ্যুৎ খাতের বেহুদা লোকসান সামলাতে পাবলিক ফান্ড থেকে ৮ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকিও দেয়া যায়, অথচ এমন ভয়ানক বিপদের দিনেও এই শহরের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্যে ফ্রি-তে চাল-ডাল সরবরাহ করা যায় না কেন?''

বাংলাদেশে নিয়মিত বেতন ও মজুরি পেয়ে কাজ করেন এরকম মানুষ সংখ্যায় খুবই কম। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বনিয়োজিত। আসলে টুকটাক অর্থনীতিই বাংলাদেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অবলম্বন। কেউ টুকরা ব্যবসা, কেউ এখানে-সেখানে কাজ করে, বহুতল ভবনে ঝুলে, ভদ্রলোকদের সেবা করে নিজেদের আয় খুঁজতে চেষ্টা করেন। কোনোটাই স্থায়ী নয়, কোনোটাই নিয়মিত নয়। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, কৃষি শিল্প আর পরিষেবা খাতে প্রায় ৬ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৫ কোটি মানুষই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে অর্থাৎ যাদের নিয়মিত আয় নেই। যাদের জীবিকা নির্ভর করে প্রতিদিনের হাড়ভাঙা কাজের ওপর। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আবার নারীর অনুপাত বেশি। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে এই কোটি কোটি মানুষ এখন দিশেহারা। করোনা ছাড়াই তাদের জীবন বিপন্ন। এদের জন্য রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা গ্রহণ করল?

করোনাকালে প্যাকেজ

করোনা ভাইরাসে বিশ্বের কয়েকশো কোটি মানুষ যখন শুধু মৃত্যুভয় নয়, অনাহার আর দারিদ্র্যের ভয়াবহতার মুখোমুখি তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকার র‍্যাংকিং করলে দেখা যায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র সবচাইতে নির্মম ও নির্লিপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদেশে যে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ বাস করে তা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের চিন্তার মধ্যে আছে বলেই মনে হয়নি।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ক্ষমতায়, সেখানেও প্রথমেই তিনমাসের জন্য তিন রূপী কেজি দরে চাল এবং দুই রূপী কেজি দরে গম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ সব অস্থায়ী কর্মীদের পুরো মাসের বেতন দেওয়া হবে। এর বাইরে ভারতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী আরও সমর্থন ঘোষণা করা হয়েছে। কেরালায় ২০ হাজার কোটি রূপীর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত হল দরিদ্র নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা, ঋণ, বিনামূল্যে খাদ্য, ভর্তুকিতে খাদ্য এবং বকেয়া পরিশোধ। পশ্চিমবঙ্গেও স্পষ্ট কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

চরম ব্যবসাবান্ধব ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে ২ ট্রিলিয়ন (২ লক্ষ কোটি) মার্কিন ডলারের এক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যার একটা বড় অংশ বোয়িংসহ বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীই পাবে। তবে সেখানেও কাজ হারানো বা আয় কমে যাওয়া মানুষদের কিছু সমর্থন দেবার অংক আছে। নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এককালীন ১২০০ মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশে করোনা সংকট মোকাবিলায় এরকম কর্মসূচি ছিল বিলম্বিত এবং খুবই দুর্বল। ২৫ মার্চ থেকে সরকারের একাধিক প্যাকেজে প্রায় লক্ষ কোটি টাকার নানা প্রণোদনা ভর্তুকি সুদে ঋণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এসব প্যাকেজে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা না থাকায় লকডাউনও অকার্যকর হয়ে পড়ে। এককালীন অপ্রতুল ত্রাণ সরবরাহের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা

হয় তাতেও দুর্নীতির অভিযোগ বাড়তে থাকে। সর্বশেষ নগদ টাকার ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ উঠছে। সরকার যে কয়েকদফা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, প্রথমটি ছিল রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য। সেটা ঋণের প্যাকেজ, দুই শতাংশ সুদে/সার্ভিস চার্জে ঋণ। এগুলো সুনির্দিষ্ট করতেও সময় গেছে অনেক। যতটুকু বোঝা যায়, যারা করোনা-পূর্ব সময় থেকে ব্যাংকগুলোর ঋণসুবিধা পাচ্ছিল তারাই এবারেও ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। সরকার বলেছে এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য। প্রশ্ন হল, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা তো কারখানাগুলোর এমনিতেই দেওয়ার কথা। খুব কমদিনই উৎপাদন বন্ধ ছিল। যে অর্ডারগুলো বাতিল হচ্ছিল সেটা তো করোনার প্রথম দিকে। পরে অনেকে আবার বাতিল আদেশ থেকে পিছিয়ে এসেছে। এক-দুই মাসের বেতনও কেন তারা দিতে পারে না? একদিকে গার্মেন্টস মালিক, বিজিএমইএ, সরকার এবং অন্যদিকে ব্র্যান্ড ও বায়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর ঠেলাঠেলির কারণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কয়েকদফা ঢাকা থেকে যাওয়া আবার আসায় মহাদুর্ভোগে পড়তে হল, যা করোনা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। এখন পর্যন্ত বকেয়া মজুরির জন্য শ্রমিকদের রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে। গার্মেন্টস মালিকদের দাবিদাওয়া সরকারের কাছে সবসময়ই অগ্রাধিকার পায়, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম থেকেই ছাঁটাই নিয়ে সবার উদ্বেগ ছিল, ছাঁটাই হয়েছে। জুন মাসে আরও ব্যাপকভাবে ছাঁটাই হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি।

পরের প্যাকেজে সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে ছোট এবং মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কৃষকদের জন্যও ঋণের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষকদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা, যে কৃষিপণ্য উৎপাদন হচ্ছে সেটা বাজারজাতকরণ, যার ফলে কৃষিপণ্যের দাম নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। করোনা-পূর্ব কালেও পরিবহন এবং বাজারজাতকরণের সমস্যায় কৃষকরা বরাবরই ভুগেছেন। পরিবহন বন্ধ থাকায় কৃষকদের ফসলের যুক্তিসঙ্গত দাম না পাওয়ার পুরনো সমস্যা এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখন বোরো ধান তোলার মৌসুম। ফসল কাটতে হচ্ছে, বাজারে তুলতে হবে। সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান বা চাল কিনলে কৃষকদের একটা ভরসা থাকত, কিন্তু তাতেও শ্লথগতি। কৃষকদের নিজে বেঁচে থাকার জন্য এবং পরবর্তী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কৃষি-উপকরণ, উৎপাদন খরচ। কৃষিমজুর যারা অন্য এলাকায় গিয়ে মৌসুমি মজুর হিসেবে কাজ করেন তাদের বেশিরভাগ এবারে কাজ করতে না পারায় কয়েকমাসের অনিশ্চয়তায় পতিত হলেন। এই পরিস্থিতিতে তারা কিভাবে কী করবেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণখেলাপিদের জন্য সুবিধা ঘোষণা করেছে। কিন্তু যথারীতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতি তাদের কোনো নজর নেই। 'এমপি' সাহেবদের যে বড় অংকের থোক বরাদ্দ দেয়া আছে সেগুলোও বর্তমান সংকটে কোনো কাজে লাগানোর ঘোষণা নেই।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য সরকারি কর্মসূচি বুঝতে একটি রিপোর্ট সহায়ক হবে। ৩০ এপ্রিল নাগরিকদের উদ্যোগে গঠিত 'দুর্যোগ সহায়তা মনিটরিং কমিটি' তার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে। ২৩ মে প্রকাশ করে তাদের দ্বিতীয় রিপোর্ট। কমিটি সরকারি দলিলপত্র ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করে এই রিপোর্টে জানায় যে, ১৪ মে পর্যন্ত সারাদেশের ৬৪টি জেলায় মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ৮শ ১৭ মেট্রিক টন চাল, ৭২ কোটি ৩৩ লাখ ৭২ হাজার ২শ ৬৪ নগদ টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৯ কোটি ১৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের চাল ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী ৩৬ টাকা কেজি ধরলে সর্বমোট বরাদ্দ টাকার হিসাবে ৬৭৭ কোটি ৬১ লাখ ৮৪ হাজার ২শ ৬৪ টাকা। দেশে বর্তমানে মোট দরিদ্র মানুষের মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ১৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯শ ৪৫ জন। অর্থাৎ ১৪ মে পর্যন্ত মোট দরিদ্র জনসংখ্যার মাথাপিছু বরাদ্দ চাল, নগদ টাকা ও শিশুখাদ্য মিলিয়ে ১৬২.২০ টাকা। আর দরিদ্রতম এলাকায় মাথাপিছু বরাদ্দ আরও অনেক কম-- সর্বোচ্চ ৩২ টাকা, সর্বনিম্ন ৭ টাকা।

সর্বশেষ সরকার ৫০ লক্ষ গরিব মানুষের জন্য মাথাপিছু ২ হাজার ৫০০ টাকা প্রদানের জন্য ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। 'প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার' হিসেবে অভিহিত এই অর্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বরে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু এই বরাদ্দ নিয়েও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। গরিবদের নামে টাকা আত্মসাৎ করার জন্য এক মোবাইল নম্বর দুশবারও দেয়া হয়েছে। যদি এই বরাদ্দ টাকা পুরোপুরি ঠিকভাবে বিতরণ হয় তারপরও দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ মোট দাঁড়াবে ২ হাজার কোটি টাকার কম। মনিটরিং কমিটি পাশাপাশি তুলনা করে দেখিয়েছে দেশে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রেখে গত বছর ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা, একটি বেসরকারি কোম্পানির শুল্ক মওকুফ করা হয়েছে ৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা। দেশ থেকে প্রতিবছর পাচার হয় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা।

করোনার অসম আঘাত

'করোনা ভাইরাস হচ্ছে একটি সাম্যবাদী রোগ', এরকম কথা গত কিছুদিনে অনেকের মুখেই শুনেছি। কথাটা সত্য তবে আংশিক। সত্য এই কারণে যে, কোভিট-১৯ নামের ভাইরাসের আক্রমণ দেশ, অঞ্চল, শ্রেণি লিঙ্গ, জাতি, বয়স কোনোকিছুতেই ছাড় দিচ্ছে না। এই আক্রমণ সার্বজনীন– সকলেই এর শিকার। এর আগে আর কোনো ঘটনা বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল মানুষকে এভাবে আতঙ্কিত এবং অস্থির করেনি। আর কোনো ঘটনা এভাবে বিশ্বের সকল প্রান্তের অর্থনীতিকে বসিয়ে দেয়নি। আর কোনো ঘটনা পুরো বিশ্বকে কখনো এভাবে থামিয়ে দিতে পারেনি। এমন কোনো মানুষ নেই যিনি ক্ষমতা বা বিত্তের জোরে বলবেন যে, এতে তার কোনো ভয় নেই। এই ভাইরাস তাই মৃত্যুর মতোই সাম্যবাদী।

তবে ভাইরাসের মতো মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সাম্যবাদী কথাটা আংশিক সত্য। করোনা হোক বা না-হোক মৃত্যু অনিবার্য, সবার জন্যই। ক্ষমতা, বিত্ত, গায়ের রং, ভাষা, লিঙ্গ, অঞ্চল, পেশা, পাপী-পরহেজগার, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কোনোকিছুই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুও কি সবার কাছে একইভাবে আসে? একজন ব্যক্তির মৃত্যু স্বাভাবিক হতে গেলে জীবনও স্বাভাবিক হতে হয়। কোনো জনপদে জীবন যদি অসম্মান, নিরাপত্তাহীনতা, অধিকারহীনতা আর অনিশ্চয়তায় জর্জরিত থাকে তাহলে মৃত্যু কীভাবে স্বাভাবিক হবে? বাংলাদেশে প্রতিবছর তাই অসংখ্য অকাল অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সড়ক ঠিক না রাখা, পরিবহন ফিটনেস না দেখা, চালকদের যথাযথ জীবন নিশ্চিত না করার কারণে প্রতিদিন সড়কে মানুষ মরে, বছরে তা ৫ থেকে ৭ হাজারে পৌঁছে। সীমান্ত-হত্যা, ক্রসফায়ার, হেফাজতে নির্যাতনে মরছে মানুষ নিয়মিত। দেশে পানিদূষণের কারণে, বায়ুদূষণের কারণে ফুসফুস কিডনি নষ্ট হচ্ছে, জটিল অসুখ হচ্ছে অকালে মরছে মানুষ। সন্তান ধারণসহ নানা জটিলতা ছাড়াও নির্যাতনে, ধর্ষণে নারীর মৃত্যু প্রায়দিনের খবর। আর্থিক কারণে চিকিৎসা না পেয়ে বা ভুল চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে তার খবর পেতে চাইলে প্রতিদিনই পাওয়া যাবে। কারখানা-বস্তিতে আগুন, কর্মস্থলে, পথেঘাটে নির্যাতন ইত্যাদিতে বহুজনের মৃত্যু ঘটতে থাকে। বহুতল ভবনে ঝুলে ঝুলে কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষ মরে প্রতিবছর। তার মানে মৃত্যু অনিবার্য হলেও তার রূপ, সময়, অনিশ্চয়তা সবার জন্য একরকম নয়। সবাই শান্তি ও সম্মান নিয়ে জীবন শেষ করতে পারে না। বাংলাদেশে তাই মৃত্যুভয়ও একটা বিলাসিতা এখন। এতভাবে এদেশে অকাল মৃত্যুর পথ তৈরি আছে যে, আলাদা করে কোনো মৃত্যুভয়ের সুযোগও থাকে না।

করোনা রোগ সবাইকে ধরতে পারে ঠিকই কিন্তু সবার জন্য সমান পরিণতি আনে না। এই মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভয় করোনার চাইতেও বেশি ক্ষুধা আর কাজ হারানোর। যারা বাংলাদেশে দূষিত বায়ু আর পানির সাথে দিনরাত জীবন যাপন করেন, যথাযথ পুষ্টিলাভ যাদের সাধ্যের বাইরে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা এবং কাজ করা ছাড়া যাদের উপায় নেই তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিতেই অনেক কম, তাদের ফুসফুস কিডনি আগে থেকেই

দুর্বল তাদের ধরা করোনা ভাইরাসের জন্য খুব আরামের বিষয় । করোনা কোনো কারণে তাদের না পেলেও অন্য বহু অসুখ তাদের ধরতে ওৎ পেতে থাকে । কোনো অসুখেই তাদের জন্য চিকিৎসা পাওয়া সহজ নয় ।

করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবার প্রধান পথ জনবিচ্ছিন্নতা, স্বেচ্ছাবন্দিত্ব: 'ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন' । এই সময়ে এই শর্ত পূরণ করতে গিয়েই উদাম হল বাংলাদেশের আসল চেহারা । সবার জানা থাকার কথা তারপরও এবারই যেন অনেকের নজরে এল যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে এসব শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয় । তাদের অনেকের জন্যই বাছাই করতে হচ্ছে হয় করোনা না হয় ক্ষুধা । ঘর নেই এরকম মানুষ ঢাকা শহরেই অনেক পাওয়া যায় । রেললাইনের ধারে গাদাগাদি করে থাকে হাজার হাজার মানুষ । বস্তি, বারবার আগুন দিলেও, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস । সেখানে ছোট এক ঘরে ৪/৫ থেকে আরও বেশিজনও থাকেন । আগেই বলেছি, দেশের প্রায় ৫ কোটি মানুষ যেভাবে বেঁচে থাকার সামগ্রী সংগ্রহ করেন তার কোনো স্থায়ী, স্থিতিশীল, নিয়মিত রূপ নেই । যখন যেমন পাওয়া যায়, দিনের কাজে দিনের চলা, টুকটাক কাজ । প্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে নিয়মিত মজুরি পাবার কথা যাদের সেই গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকেরাই করোনা-সংকটকালে যখন বকেয়া মজুরি, ছাঁটাই, পুলিশ-মাস্তানের আক্রমণ ইত্যাদির মুখে দিশেহারা থাকেন তখন অন্য বহুরকম ছোট কারখানা, দোকান, পরিবহন শ্রমিকদের অবস্থা যে আরও সঙিন তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নেই । তারা কোনো মনোযোগের মধ্যেও থাকেন না । করোনা-আতঙ্ক, তা প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাবলি এই আধমরা মানুষদের তাই আরও শুইয়ে দিচ্ছে ।

করোনা থেকে বাঁচতে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে আটকে থাকা একটা বড় মানসিক এবং শারীরিক চাপ । কিন্তু ঘরে থাকার মতো ঘর থাকা, ঘরে আটকে থাকা অবস্থায় খাবার থাকা, এতদিন প্রতিষ্ঠান বন্ধ/ছুটি থাকলেও নিজের আয় নিশ্চিত থাকা যে কতবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যাদের এগুলো নেই তারা তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন । করোনার প্রভাব তাই সমাজের বিভিন্ন অংশের ওপর বিভিন্ন রকম । অনেক ব্যবসাও বসে পড়বে, অনেক উদ্যোক্তা পুঁজি হারাবেন, আবার অনেক ব্যবসায়ী মুনাফা করবেন, অনেকে সরকারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে আরও লাভ করবেন । বেকারত্ব বাড়বে, আর দিন এনে দিন খাওয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকজন, যদি বেঁচে থাকেন, আরও অপুষ্ট, অসুস্থ, ঋণগ্রস্ত, হবেন । সমাজে বাড়তে থাকা বৈষম্য আরও বাড়বে ।

তাই সব দেশে, সব সমাজে, সব শ্রেণিতে করোনা ভাইরাসের ফলাফল একরকম হবে না । কার ওপর এর প্রভাব কীরকম পড়বে তা নির্ভর করে তাদের করোনা-পূর্ব অবস্থা কী ছিল তার ওপর । তিনটি দিক এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমত, যে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্ত, অর্থাৎ যেখানে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের একটা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বাস করেন তাদের চাইতে যাদের নিরাপত্তা বলয় দুর্বল তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ । দ্বিতীয়ত, যে দেশ মুনাফা-ব্যক্তিব্যবসার বাইরে রেখে তার সর্বজনের বা পাবলিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যতবেশি দক্ষভাবে দাঁড় করাতে পেরেছে সে দেশ ততো নাগরিকদের স্বাভাবিকসময়ে যেমন এরকম সংকটকালেও তেমন সুরক্ষা দিতে পারছে । বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরের মাথায় এটাই স্পষ্ট করেছে যে, তার নাগরিকদের কথিত 'সামাজিক নিরাপত্তা জাল' শতচ্ছিন্ন, খুবই দুর্বল । আর এই দেশ সর্বজন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে গিয়ে এটাকেও একটা ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে । তৃতীয়ত, চলছে পরিবেশবিধ্বংসী 'উন্নয়নের' অন্ধ যাত্রা ।

এই তিন কারণে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বে সবচাইতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি । কিন্তু যে বৈশ্বিক ও জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নদী-বন-বাতাস-প্রাণপ্রকৃতি বিনষ্ট, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্ত দুর্বল মানুষেরা আজ মহাবিপদে, সেই একই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছল মানুষেরাও শেষ পর্যন্ত নিরাপদ থাকতে পারেন না । কারণ দেশের সংকটে বিদেশে চলে যাওয়া বা অন্য দেশে চিকিৎসা তার কোনো পথই এখন খোলা নাই । যেকোনো অসুখবিসুখ নিয়ে ভিআইপি ক্ষমতাবানদের উদ্বেগ কম থাকে, দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার হাল নিয়ে তাঁদের কখনো বিকার হয় না ।

কারণ তাঁরা সবসময়ই প্রস্তুত থাকেন যেকোনো অসুখ হলে বিদেশ চলে যাবেন। তারও কোনো উপায় এবার নেই। পৃথিবী একটাই, সংকটও এখন বিশ্বায়িত। কাজেই পায়ের নিচের মাটি ঠিক করতেই হবে।

'আল্লাহ ভরসা' এবং অপরাধীদের পরিচয়

'আমাদের আর কী হবে? আল্লাহই বাঁচাবে, মরণ আসলে কি আর বাঁচাতে পারবে কেউ?' এরকম কথা অনেকের মুখেই শোনা যায়, কিন্তু সবাই একই কারণে বলেন না। শ্রমজীবী মানুষ যাদের দিন এনে দিন খেতে হয়, বাইরে না-বের হলে না-খেয়েই মরার অবস্থা যাদের বর্তমান সংকটকালে তাঁরা এইধরনের কথা বলেন বুকে বল আনার জন্য। প্রকৃত চিত্র তুলে ধরলে, বা তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থার কিছু উপায় দিতে পারলে তাঁরাও নিয়মকানুন মেনে চলবেন। কিন্তু সংকটকালে কারও ওপর যদি ভরসা করা না যায় তাহলে নিজ জ্ঞান/ কা-জ্ঞান আর আল্লাহ ভরসা ছাড়া মানুষেরই-বা আর কী করার থাকে?

তবে মানুষের এই অসহায়ত্বের সুযোগও নেয় অনেকে, বিশেষত অপরাধীরা। যখন ঝড় জলোচ্ছাসে দুর্বল মানুষেরা মরতে থাকে অরক্ষিত থাকার কারণে, কিংবা সড়ক-লঞ্চ 'দুর্ঘটনা' শত হাজার মানুষ মরে সড়ক, পরিবহন ইত্যাদিতে ভুল নীতি আর মহা লুটপাটের কারণে, খুনি-ধর্ষকদের অবাধ রাজত্ব তৈরি হয় সমাজে ক্ষমতাবানদের কারণে, এই সময়গুলোতে কিছু লোক পাওয়া যায় যারা উঁচু গলায় বলে, 'এগুলো আল্লাহর গজব', 'পাপের শাস্তি'। অথচ এসব কথায় কোনো বিবেচনা থাকে না যে, কে পাপ করল আর মরল কে? পাপ তো বটেই, যে উন্নয়ন-ধারা মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে তা তো পাপই, তার জন্য যে বিপদ নেমে আসে তা তো গজবই। কিন্তু যাদের কারণে দেশ ও মানুষ অরক্ষিত, যাদের লোভ আর লাভের কারণে সড়কে প্রতিবছর কয়েক হাজার মানুষ মরে, যাদের কারণে দেশের নদী বন নষ্ট বা উধাও হয়ে সারাদেশের মানুষ আরও বেশি অসুস্থ আরও বেশি নাজুক হয়ে যাচ্ছে, যাদের কারণে নারী-শিশু নিরাপত্তাহীন সেই তারা তো মহা আরামেই থাকে, তারা নিয়মিত হারাম টাকা উপার্জন করলেও এদের বিরুদ্ধে কখনো বুলন্দ আওয়াজ শোনা যায় না। তারা নিয়মিত দোওয়াও কিনতে থাকে। অন্যদিকে গজব পাপ বলে মানুষকে তাদের দুর্ভোগের কারণ বুঝতে দেওয়া হয় না, রক্ষা করা হয় দুর্বৃত্তদের।

করোনা নিয়েও এরকম কথা শোনা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটা অমুসলমানদের উপর আল্লাহর গজব, এতে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে না। সৌদি আরবে মসজিদ বন্ধ, ইরানে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত, বিভিন্ন দেশে মৃতদের মধ্যেও আছেন অনেক মুসলমান। তারপরও এসব মানুষবিদ্বেষী ভ্রান্ত কথাবার্তা চলছেই। আর বিশ্বে আজ যে ভয়াবহ মারণাস্ত্র গবেষণায় আকাশ বাতাস পানি জমিন বিপর্যস্ত, যে পারমাণবিক বর্জ্য আর ইলেকট্রনিক বর্জ্যে মানুষের বিপদবৃদ্ধি সেই উন্নয়ন বা সেই মুনাফার আর ক্ষমতার উন্মাদনার মধ্যে যারা কর্তা তাদের মধ্যে যেমন বিশ্বাসী আছে, তেমনি আছে অবিশ্বাসী; আছে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান সবাই, তারা দুনিয়ার মানুষের ১ শতাংশ। আর যারা বিপদে, যারা বিপন্ন মানুষ, তাদের মধ্যেও বিশ্বাসী আছে, আছে অবিশ্বাসী; আছে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু মুসলমান, আর তারাই দুনিয়ার মানুষের ৯৯ শতাংশ। ধর্ম বা বিশ্বাস দিয়ে যেমন পাপী বা নিপীড়কদের ভাগ করা যায় না তেমনি ভাগ করা যায় না মজলুম মানুষদেরও। আর শুধু মানুষই নয়, বর্তমান মুনাফা উন্মাদ বিশ্বযাত্রার শিকার জগতের সকল প্রাণ।

করোনা ভাইরাসের যথাযথ ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি, কাজ করছেন অনেকেই। তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যথাযথ চিকিৎসা-সমর্থন পেলে কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগই বেঁচে যান। এই সমর্থনের জন্য যে চিকিৎসা অবকাঠামো দরকার তা বাংলাদেশে নেই বলে ব্যাপক হারে এই ভাইরাসের আক্রমণে আমাদের বিপদ অনেক বেশি।

সরকার যখন দেশকে 'স্বাভাবিক' অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে তখন করোনা রোগে আক্রান্তের হার বৃদ্ধির দিকে, মৃত্যুর হারও বাড়ছে। আক্রান্ত হলে বেশিরভাগ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ নেই, বিনা চিকিৎসায় কতজন মরছেন তার হিসাব নেই, সুস্থতার হার অন্য বহুদেশের তুলনায় অনেক কম। অনাহার-অনিশ্চয়তার ভয় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে।

করোনা সংকটঃ আশু থেকে দীর্ঘমেয়াদে করণীয়

করোনা-সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের বিভিন্ন মাত্রা আছে। এর মোকাবেলায় করণীয়গুলোকে আশু বা স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এভাবে ভাগ করে কর্মসূচি হাতে নেয়া দরকার ছিল। করোনা সনাক্ত হবার পরই সরকারের আশু করণীয় ছিল ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জন্য কয়েকমাসের বেঁচে থাকার অর্থ/সামগ্রী জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তিনমাস পরেও সেই কর্মসূচি নেয়া হয়নি। তবে সরকার ও তার বাইরে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি/গোষ্ঠী থেকে এককালীন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

করোনাভাইরাসের সংকটের কারণে বিশাল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আগেই বলেছি, সরকারি হিসাবেই প্রায় চার কোটি মানুষ আগে থেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে, তাদের অনাহার, আশ্রয়ের সমস্যা তো ছিলই। করোনায় যখন সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল তখন তাদের মৃতপ্রায় দশা। তাদের সাথে এখন যোগ হয়েছে প্রান্তিক সীমার দরিদ্ররা, তাতে প্রায় ৮ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মানুষদের তো এমনিতেই সার্বক্ষণিক অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়। পরিবহন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, বিভিন্ন ধরনের কারখানা শ্রমিক, কৃষিমজুর, দিনমজুর, গৃহশ্রমিক, হকারসহ যাদের অস্থায়ী বা খ-কালীন বা অনিয়মিত কাজ তাদের জন্য পরিস্থিতি খুবই সঙিন। গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন কারখানা প্রাতিষ্ঠানিক খাত হলেও শ্রমিকদের জন্য অনিশ্চয়তায় ভরা। অনেকের কাজ থাকলেও মজুরি নেই, বকেয়াও পড়ে আছে অনেক। আবার নিয়মকানুন না মেনে অনেকের ছাঁটাই-এর হুমকি। সেজন্য করোনাকালেও বকেয়া মজুরির জন্য তাদের বারবার রাস্তায় আসতে হচ্ছে। শুধু শ্রমিক নয়, ব্যাংক-বীমা-মিডিয়াসহ বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মী-পেশাজীবীদের জন্যও অনিশ্চয়তা কম নয়। ছাঁটাই, বকেয়া বেতনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে প্রায়ই।

কোভিড ১৯ সংক্রমণ পৃথিবীব্যাপী প্রকাশ হতে শুরু করেছে জানুয়ারি মাস থেকে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কিংবা লকডাউন এগুলো এই ভাইরাসকে মোকাবেলার পথ হিসেবে এখন সর্বজনস্বীকৃত। এসব নিয়ে বাংলাদেশে ধারণা ছিল না, থাকার কথাও না। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করার পরেই যেটা দরকার ছিল-- বিভিন্ন সম্ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মেয়াদে সামগ্রিক পরিকল্পনা করা। কেননা যদি লকডাউন পর্যন্ত যেতে হয় তাহলে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যে কর্মহীন হবে এটা বোঝা কঠিন ছিল না। তাছাড়া মানুষকে স্বেচ্ছাবন্দিত্বে রাখতে গেলে তাদের থাকার জায়গাও দিতে হবে। বাংলাদেশে ফুটপাতে, রেললাইনের ধারে বহু মানুষ থাকে, বস্তিতে ছোট ঘরে পাঁচ-দশ জন মানুষ থাকে। থাকার মতো ঘর নেই, আবার থাকলেও কাজ বাদ দিয়ে ঘরে থাকতে হলে খাবার নেই। হিজড়া, যৌনকর্মী, বেদে, দলিতসহ ভাসমান জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার সংকট আরও প্রকট। তাই জনগোষ্ঠীর একটা অংশের জন্য আশ্রয়ের এবং বৃহৎ অংশের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা এ দুটো বিষয় নিশ্চিত করেই লকডাউন, পরিবহন বন্ধ, 'সাধারণ ছুটি' ইত্যাদির মধ্যে যাওয়া উচিত ছিল। শর্তপূরণ না করে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘরে থাকতে বলার কারণেই সেটা কার্যকর হয়নি। এসব ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কোনো কাজে আসে না। কারণ বাংলাদেশে এখন এমন অনেক লোক আছে, যারা জেলে যেতে পারলেও খুশি হবে। জেলে গেলে তবু খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বৈশ্বিক মহামন্দার মুখে বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে অভ্যন্তরীণ বাজারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ছোট-বড়-মাঝারি শিল্প, আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে কৃষি। তার মানে মহামারি-উত্তর দেশে অভ্যন্তরীণ বাজারের সাথে যুক্ত করে শিল্প বা কৃষি যথা সময়ে যাতে সক্রিয় হতে পারে তা নিশ্চিত করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মানুষেরা যাতে ঠিকঠাকভাবে কাজে ফিরতে পারে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। অনেকে এনজিও ঋণের উপর নির্ভরশীল, এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিষ্কার হওয়া দরকার। ঋণের কিস্তি এখন বন্ধ রাখতে হবে, সুদের হার অবশ্যই কমাতে হবে এবং সুলভ করতে হবে। আর ব্যাংকগুলোর গতিশীলতা আনতে বিদেশে সম্পদ পাচার করার অবাধ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। সামনে রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই খুঁটি, কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে ঋণখেলাপিদের প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা যদি বন্ধ না-হয়, সম্পদপাচার যদি বন্ধ না-হয় তাহলে বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক সংকট করোনার আগেই দানা বাঁধছিল তা আরও ভয়ংকর অবস্থার দিকে যাবে।

সব দেশে জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ একইমাত্রায় ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা আর অভূতপূর্ব বিপদের মধ্যে পতিত হয়নি, বাংলাদেশে হয়েছে। কারণ বিশ্বজুড়ে বহু দেশের সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিকেরই প্রাপ্য থাকে, যেমন-- খাদ্য, ন্যূনতম আয় বা বেকারত্ব ভাতা, চিকিৎসা ইত্যাদি। এদেশের নাগরিকদের জন্য এসব সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণই করা হয়নি কখনো। একসময় রেশনিং প্রথা ছিল সেটাও বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর পরামর্শে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'সোশাল সেফটি নেট' বলে যেটি চালু আছে তা সামাজিক নিরাপত্তা নয়।

করোনাকালে নাগরিকদের উদ্যোগ ও সুপারিশ

যে দেশে 'স্বাভাবিক' সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না সেখানে করোনা যে সবাইকে মহাসমুদ্রে ফেলে দেবে এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। করোনা অচলাবস্থা যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই বহু মানুষের আরও বেশি মাত্রায় কর্মহীনতা, অনাহার, অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। একইসাথে দেখা দিয়েছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব। প্রথমদিকে যখন সরকার অপ্রস্তুত, বিভিন্ন বড় গোষ্ঠীও এগিয়ে আসেনি তখন সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর উদ্যোগই ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় মার্চ মাসের ৮ তারিখ। দিনে দিনে সরকারের প্রস্তুতির দৈন্য ও সমন্বয়ের সমস্যাও প্রকট হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের বিভিন্ন অংশের পক্ষ থেকে ত্রাণ তৎপরতা ছাড়াও জরুরী করণীয় নিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুপারিশমালা হাজির করা হয়।

এর প্রথমটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি (২২ মার্চ, ২০২০), দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছিল যুক্ত বিবৃতি, দেয়া হয় যথাক্রমে ৩১ মার্চ ও ২ এপ্রিল। এছাড়া করোনাকালে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ১৩ এপ্রিল। ২২ এপ্রিল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে করণীয় সুপারিশমালা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া গার্মেন্টস মালিক, বিজিএমইএ এবং সরকারের ভূমিকা কীভাবে গার্মেন্ট শ্রমিকদের নিয়ে নিষ্ঠুর তৎপরতা চালিয়েছে তার প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে 'মারণখেলার টাইমলাইন (২১ মার্চ-২৫ এপ্রিল ২০২০)' এবং ত্রাণের দাবিতে ও ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের বিক্ষোভের একটি টাইমলাইন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং-এর উদ্যোগও নেয়া হয় এপ্রিল মাস থেকে।

২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠিতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের সাথে সাথে মূল দাবিগুলো ছিল: (১) শ্বেতপত্রের মাধ্যমে করোনা মহামারী রোধের পরিকল্পনা ও তা কার্যকর প্রণালী জনসমক্ষে প্রকাশ করা। (২) দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে টেস্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় কিটসহ বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ এবং তার ব্যবস্থাপনা

নিশ্চিত করা। মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার যোগান নিশ্চিত রাখা। কিট তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে দ্রুত খালাস ও ট্যাক্স-মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৩) দেশের সকল প্রবেশপথ-- বিমান, নৌ, স্থলবন্দর, রেলস্টেশন, নৌঘাট সতর্ক নজরদারির আওতায় আনা। (৪) কোয়ারেন্টিনের জন্যে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে বড় হোটেল-মোটেল-রিসোর্টসহ উপযোগী ভবনগুলো অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট করা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম, খালি ভবনে অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীকে যুক্ত করা। সিএমএইচ, বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে সমন্বিত পরিকল্পনায় যুক্ত করা। (৫) ডাক্তার-নার্স-চিকিৎসাকর্মীসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপদ পোশাক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা। স্বাস্থ্যকর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। দেশের গার্মেন্টস কারখানা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই সরবরাহ। (৬) গণপরিবহন ও গণপরিসরগুলো নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ। জেলখানার ঝুঁকিপূর্ণ জনচাপ দূর করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা, জনচাপ কমাতে বিনা বিচারে আটক, মেয়াদ-উত্তীর্ণদের মুক্তি দান। ছিন্নমূল ভাসমান মানুষদের জন্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়শিবির খুলে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া। গাদাগাদি বাস করা বস্তিবাসীদের নিরাপত্তায় প্রতিটি বস্তিতে পরিচ্ছন্নতার উপকরণ সরবরাহ এবং করোনা মনিটর সেল/ক্যাম্প স্থাপন করা। রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রেও অনুরূপ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করবার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৭) করোনা সংক্রান্ত জরুরি কাজ ছাড়া পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে সবেতন ছুটি প্রদান। ছুটিকালীন শ্রমিকদের মজুরি যাতে ঠিকমতো পরিশোধ হয়, সরকারের তা নিশ্চিত করা। (৮) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারি বন্ধ করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়, নিম্ন আয়ের এবং রোজগার হারানো মানুষদের জন্যে রেশনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। উদ্বাস্তু, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, বস্তিবাসী, কারখানার শ্রমিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, ছোট ব্যবসায়ীসহ যাদের জীবিকা হুমকির মুখে তাদের জন্যে বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান। ঋণখেলাপি, চোরাই টাকার মালিকদের কোনো বাড়তি সুবিধা না দেয়া। (৯) বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্যকর্মী, ধর্মীয় নেতাদের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয় ক্লাব, সংগঠন ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করে তাদের প্রচার ও রোগ-প্রতিরোধে কাজের সুযোগ দিতে হবে। (১০) এর পাশাপাশি ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া মোকাবেলায় সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশ।

৩১ মার্চ যুক্ত বিবৃতিতে করোনা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ এবং মতপ্রকাশের অধিকারের দাবি জানানো হয়। ২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, সংগঠকদের পক্ষ থেকে দেয়া আরেক যুক্ত বিবৃতিতে করোনা ভাইরাসে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে সরকারের করণীয় বলে ছয়টি কাজ নির্দেশ করা হয়। এগুলো হল: (১) অন্তত তিনমাসের জন্য এক কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে খাদ্যসহ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির যোগান। (২) বিনামূল্যে সকলের চিকিৎসা নিশ্চিত করা। (৩) কৃষকের ফসল, সব্জি, ফলের সঠিক দাম নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কৃষিপণ্য ক্রয়ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। (৪) সকল প্রতিষ্ঠানে বেতন-মজুরি নিশ্চিত করা। (৫) ক্ষুদে উদ্যোক্তা ও কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সহজলভ্য করা। এবং (৬) পাহাড় ও সমতলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তা প্রদান করা, চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে ৭০ থেকে ৯০ হাজার কোটি টাকার একটি প্যাকেজ বরাদ্দ প্রয়োজন। আর এই বরাদ্দের জন্য জনগণের ওপর নতুন বোঝা চাপানোর দরকার হবে না। কয়েকটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে জনগণের লুণ্ঠিত সম্পদের কিয়দংশ উদ্ধার করলেই এই বিপদ থেকে জনগণকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কারণ গত দশ বছরে দেশ থেকে বাইরে পাচার হয়েছে কমপক্ষে ৭ লক্ষ কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে খেলাপি ঋণ প্রায় দেড় থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা, এর মধ্যে দশটি গ্রুপের হাতেই আছে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। সরকারের পক্ষে এদের চিহ্নিত করা খুবই সহজ, এদের অর্থ বিদেশ থেকে

ফেরত আনা সময়সাপেক্ষ হলে দেশে তাদের সম্পদ বাজেয়াফত করে সরকার এই বিপদকালীন তহবিল গঠন করতে পারে।

এরপর ২২ এপ্রিল অনলাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত বিস্তারিত সুপারিশমালার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল: (১) কর্মহীন, স্বল্প আয়ের মানুষদের (মজুর, বেকার, ক্ষুদে ব্যবসায়ী) ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী, নগদ অর্থ ও ত্রাণ পৌঁছানো। (২) সকল শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবীদের বকেয়া পরিশোধ, ছাঁটাই বন্ধ, এবং ছুটিকালীন পূর্ণ মজুরি নিশ্চিত করা। (৩) কোভিড-১৯ সহ সকল রোগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। কোভিড-১৯ চিকিৎসায় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন, প্রতি জেলায় ল্যাব স্থাপন করে টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো। সকল ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত পিপিই প্রদান করা, আবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজগুলোতে তাদের থাকার ব্যবস্থা। যে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসা দিতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান। স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। (৪) সকল কৃষক ও খামারির পণ্য বাজারজাতকরণ এবং যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রয় নিশ্চিত করা। সরাসরি কৃষক ও খামারি থেকে সরকারের খাদ্যপণ্য ক্রয়ের পরিধি বাড়ানো। কৃষককে স্বল্পসুদে দেয় ঋণের পরিধি ও পরিমাণ বাড়ানো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সরকার, ব্যাংক ও এনজিও প্রদত্ত ঋণের সকল কিস্তি স্থগিত করা। (৫) মহাদুর্যোগ মোকাবিলায় অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। (৬) দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, বাজারে খাদ্যদ্রব্য সহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা। মজুতদার, চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। সারাদেশের ত্রাণচোরদের কঠোর হস্তে দমন। (৭) জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও গবেষণা বাড়ানো। এবং (৮) দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন দর্শনে মৌলিক পরিবর্তন আনা।

উপরের বর্ণনা দেখে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, নাগরিকদের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সুপারিশে সরকার সাড়া দিলে বাংলাদেশ এখন অনেক নিরাপদ থাকত। বিশ্বব্যাপী করোনা সংকট পরিবর্তনের অনেক বার্তা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সর্বজনের সম্পদ কিছুজনের হাতে স্থানান্তর, নাগরিকদের জীবন তুচ্ছ করা ও দেশ বিপন্ন করে নানা প্রকল্প গ্রহণ, নাগরিকদের কোনো মতামত গ্রহণ না-করার রাষ্ট্রনৈতিক চর্চা অব্যাহতই থাকছে। তাই বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের বিপদ আর বিপন্নতাও বাড়ছে।

করোনার বার্তা

বিশ্বকে থামিয়ে দিল যে করোনা সেই থামাটা যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই থামায় মানুষ ছাড়া দুনিয়ার আর সবাই যেন এখন স্বস্তিতে। কারণ বিশ্বের সাগর মহাসাগর বায়ুম-ল নদী-পাহাড় সব মুনাফার তা-বে ক্ষতবিক্ষত। কিছু লোকের অতিভোগে, লোভে আর হিংস্রতায় বিশ্ব কাতর। সামরিকীকরণ আর প্লাস্টিকের জৌলুস মানুষকে ঢেকে দিচ্ছে। শ্বাস নেবার বাতাস আর পানের পানিও ঢেকে যাচ্ছে মারণাস্ত্র আর বিষে। মুনাফার পেছনে উন্মাদ হয়ে দুনিয়া যেভাবে ছুটছিল তাকে কেউ থামাতে পারেনি, এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস থামিয়েছে। কঠিন নির্মম থামা। বিশ্ব যে অখ- সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে এই বিপদ ভাইরাস। কিন্তু উন্মাদ ছোটাতে যে মানুষেরা বিপদে থাকে, থামাতে-ও তাদেরই বেশি ক্ষতি। এই থামা যদি দুনিয়ার গতিমুখ পরিবর্তন করতে না পারে এরপর আরও বড় বিপদ থেকে মানুষের উদ্ধার নেই।

করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক সংকট আরও স্পষ্টভাবে আমাদের জানাল যে, স্বাস্থ্যসেবা কোনোভাবে বেচাকেনার বিষয় হতে পারে না, ব্যক্তিগত মুনাফার ক্ষেত্র হতে পারে না, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বজনের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে চিকিৎসা খাতে জিডিপি অনেক

বেড়েছে, কারণ বাণিজ্যিক হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অনেক বিনিয়োগ হয়েছে। সেগুলোর জৌলুস অনেক বেশি, খুবই ব্যয়বহুল, পাঁচতারা হোটেলের মতো থাকার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু যখন আমরা করোনায় বিপর্যস্ত তখন এই বাণিজ্যিক হাসপাতালগুলোর অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কারণ এই ব্যাপক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ে যথাযথ ভূমিকা পালনে লাভের বিষয়টি নিশ্চিত নয়। যদি দেশে এরকম পরিস্থিতি থাকত যে, ঢাকা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বজন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা কাজ করছে, গ্রাম পর্যায়েও পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার-নার্স, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, চিকিৎসা সরঞ্জাম আছে, যদি চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে এগিয়ে থাকত তাহলে বাংলাদেশের মানুষ আজ অনেক নিরাপদ থাকতেন। একদিকে অনাহারে অন্যদিকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হুমকির মুখে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষকে থাকতে হত না।

বস্তুত করোনাকালে বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তাহীনতার ভিত্তি বর্তমান উন্নয়ন ধরনের মধ্যেই। খেয়াল করতে হবে যে, যে উন্নয়নের ধারায় আমাদের বন শেষ হয়ে যায়, নদী দূষিত হয়, প্রাণ-প্রকৃতির বিনাশ হয়; যে উন্নয়ন ধারায় ব্যাংক, প্রবাসী আয়, সর্বজনের সম্পদের উপরে কতিপয় গোষ্ঠী আধিপত্য বিস্তার করে, সম্পদ পাচার করে, লুণ্ঠন করে; যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটে এবং গণতন্ত্র বিপন্ন হয় তা কখনোই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। যে উন্নয়নে মানুষের খাদ্য-পুষ্টি-চিকিৎসার গুরুত্ব নেই, মতপ্রকাশ ও নিরাপত্তার গুরুত্ব নেই, ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা নেই, প্রাণ-প্রকৃতি নদীনালা খালবিলের গুরুত্ব নেই তা যে কোনো উন্নয়ন নয় তা সামাজিক উপলব্ধির মধ্যে আনা দরকার। প্রকৃত উন্নয়নের পথে হাঁটতে গেলে জরুরি ভিত্তিতে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেগুলো হল:

- সুন্দরবনসহ প্রাণ-প্রকৃতি-বিনাশী সকল কয়লা এবং পারমাণবিক প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব, সুলভ, স্বনির্ভর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা। অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর প্রকল্প বাতিল করে তার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জরুরি ত্রাণ, চিকিৎসা ও জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে ব্যয় করা।
- দেশের সমগ্র স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে ব্যক্তি ব্যবসা মুনাফামুখী অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করা। এই খাতে জিডিপি-র কমপক্ষে ৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব প্রদান। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসা গবেষকদের জন্য বিশেষ বেতন স্কেল তৈরি করা যাতে তাদের আয়ের অন্য উৎস খুঁজতে না হয়।
- পরিবেশ দূষণের সকল তৎপরতা বন্ধ করা। পরিবেশ রক্ষায় নদী দূষণ-দখল বন্ধ, ইটভাটা বন্ধ করতে হবে। যেসব কারখানা ইটিপি ব্যবহারে শৈথিল্য বা প্রতারণা করে তাদের লাইসেন্স বাতিল। পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও অদিধপ্তরে জনবল বাড়িয়ে স্বাধীন ও ক্ষমতাসম্পন্ন করা।
- কৃষি ও পাটসহ পরিবেশবান্ধব শিল্পে অগ্রাধিকার প্রদান। এবং
- সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় নিশ্চিত করা; সকল নাগরিকের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সামগ্রী যোগান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ। এর আশু ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ণ রেশনিং চালু করা।

করোনাকালে উন্নয়ন-দর্শনে মৌলিক পরিবর্তন আনার সামাজিক চৈতন্য জোরদার করতে হবে। নিছক জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং অন্ধ মুনাফামুখী তৎপরতা নয়; সর্বজনের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-চিকিৎসা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও নিরাপত্তাকেই উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। করোনা সংকট আমাদের সেই তাগিদই দেয়।

[লেখক পরিচিতি: গণমুখী চিন্তক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, সংগঠক। অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্র ব ন্ধ

করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র

আ বু ল বা র কা ত

খোলা চোখে অদৃশ্যমান আকার-আয়তনে এত ক্ষুদ্র একটা জিনিস যে বিশ্বের প্রায় সব মানুষকে এতটা দৃশ্যমান অসহায় করতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ করোনাভাইরাস-১৯ বা কোভিড-১৯। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমার মত সামাজিক বিজ্ঞানীর পক্ষে মন্তব্য করা ধৃষ্টতা এবং তা যথেষ্ট বিজ্ঞানম্মত নাও হতে পারে। আর সে কারণেই করোনাভাইরাস-১৯ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণাটা বলে রাখা প্রয়োজন। ধারণাটা এরকম: আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য একটা সিস্টেম আছে যাকে বলা হয় ইমিউন সিস্টেম। এ সিস্টেমকে তুলনা করা চলে বিশাল এক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে। এ বাহিনীর কাজ হল হয় কোনো শত্রুকে শরীরে ঢুকতে না দেয়া অথবা ঢুকলেও তাকে বাড়াবাড়ি করতে না দেয়া, ক্ষতি করতে না দেয়া, অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। কিন্তু করোনাভাইরাস এক মহাধড়িবাজ শত্রু যে অতি সন্তর্পনে ফাঁকি দিয়ে বন্ধুবেশে আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করে – মুখ, নাক, চোখ দিয়ে। করোনার চারপাশে একটা দেয়াল বা পোশাক আছে। পোশাক পরা অবস্থায় সে যথেষ্ট ভদ্রলোক। ধড়িবাজ এ ভদ্রলোকটি আশ্রয় নেয় আমাদের দেহের কোষে। থাকে সুযোগের অপেক্ষায় কখন সে আমাদের দেহকোষে ঢুকে তার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সুইচ অন করবে। এ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাওয়া মাত্রই একসময় তার পোশাকের মধ্যে যে আরএনএ ভাইরাস আছে তা বিস্তারের জন্য সে সুইচ অন করে। তখনই চালু হয়ে যায় ধড়িবাজ করোনাভাইরাস-এর সংখ্যা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে সংখ্যা এতই বাড়ে যে আক্রান্ত কোষগুলো ভাইরাসকে ধারণ করার ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং কোষটি ফেটে যায়। এভাবে এক একটা করোনাভাইরাস থেকে তৈরি হয় লক্ষ লক্ষ করোনাভাইরাস। আর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দ্রুত জন্ম নেয় কোটি কোটি কোটি করোনাভাইরাস, এবং আক্রমণ করে সে আমাদের শ্বাসতন্ত্রকে। এক পর্যায়ে শ্বাসতন্ত্র তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করতে অক্ষম হয়ে যায়; বিকল হতে থাকে শ্বাসতন্ত্রের পুরো যন্ত্রটি। এরপর হয় অসুস্থতা আর শ্বাসতন্ত্র দুর্বল হলে আশঙ্কা থাকে মৃত্যুর।

বিজ্ঞানীরা এ ভাইরাসে আক্রান্ত অথবা আক্রান্ত-সম্ভাব্যদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভ্যাকসিন আবিষ্কার, চিকিৎসা, আক্রান্ত-সম্ভাবনা কমিয়ে আনা, বিস্তার রোধ, উৎপত্তির কারণ, ভাইরাস বিস্তার রোধের পথ-পন্থা উদ্ঘাটন থেকে শুরু করে ক্ষতি হ্রাস কৌশল নিয়ে দিবানিশি কাজ করছেন। সিরিয়াস সমাজচিন্তক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন 'করোনাভাইরাস-১৯' হলো "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"। কথাটি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু যেটা দিবালোকের মতো সত্য, সার্বজনীন সত্য, নিরঙ্কুশ সত্য তাহলো এ ভাইরাস আমাদের জন্য সাধারণ কোনো ঝুঁকি বা রিস্কের কারণ নয়, এ ভাইরাস আমাদের জন্য– বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরঙ্কুশ অনিশ্চয়তা বা আনসার্টেনিটির কারণ। কারণ যদি শুধু ঝুঁকি হতো তাহলে আমরা ঝুঁকির বিভিন্ন দিক পরিমাপ করতে পারতাম এবং সে মাফিক সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু অনিশ্চয়তা তো মাপজোক করা যায় না; আর তাই অনিশ্চয়তার বিভিন্ন দিক মোকাবেলার বিজ্ঞানসম্মত পথ-পদ্ধতি বাতলানোও সম্ভব নয়– এসব নিয়ে পরীক্ষিত কোনো তত্ত্বও নেই। তবে আমার মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার এক বা একাধিক সিনারিও বা কল্পচিত্র বিনির্মাণ করে প্রতিটির বিপরীতে সম্ভাব্য সমাধান চিত্র আঁকতে হবে। এ

বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এক্ষেত্রে যে তত্ত্ব সব চেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে তা হলো শক্তিশালী 'সাধারণ জ্ঞান' বা কমনসেন্স। তবে বলে রাখি এ ধরনের কমনসেন্স যথেষ্ট আনকমন। আর বিষয়টা যখন বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস-১৯ তখন তা আরও অনেকগুণ বেশি প্রযোজ্য। এটাও সত্য যে খণ্ড চিত্র পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয় আবার খণ্ডচিত্র নির্ভর উপসংহার হতে পারে যথেষ্ট মাত্রায় বিভ্রান্তিকর অর্থাৎ বিষয়টিকে সমগ্রকতার নিরিখে দেখতে না পারলে সমাধানের কল্পচিত্রও হবে খণ্ডিত। এটাও বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা।

করোনাভাইরাস-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা এবং সমাধানের লক্ষ্যে উত্থাপিত কল্পচিত্রটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব ভাবনা। কোনো প্রমাণিত তত্ত্ব অথবা প্রাক-অভিজ্ঞতা উদ্ভূত নয়। তবে সমাধান-উদ্দিষ্ট ভাবনার পেছনে বেশ কিছু যুক্তি আছে যা পরে বলেছি।

আমার মূল বক্তব্যটি এরকম: বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব; ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব।

কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধে এখন পর্যন্ত ভাইরাস-আক্রান্ত রুগী নির্ণয় বা ডিটেকশন, সঙ্গরোধ বা কোয়ারেনটাইন, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলা, সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরলস শ্রম—আর এসবের পাশাপাশি ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ও চিকিৎসা সহায়তা—সম্মিলিতভাবে এসবই একদিকে যেমন দেশে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এবং অবস্থান-ঠিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্যচিত্র দেবে তেমনি তা করতে পারলে এমন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে যার ফলে রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে অথবা বিস্তার-গতি কমবে। অর্থাৎ বিস্তারের ঊর্ধ্বমুখী গতিপথ নিঃসন্দেহে নিম্নমুখী হবে।

একটি বিষয়ে বিজ্ঞানিদের কোনো দ্বিমত নেই যে, যে কোনোভাবেই হোক না কেন আক্রান্ত মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাকে কমিয়ে আনতে হবে। আসলে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাটা কত হলে 'কম' বলা যাবে তা নিয়ে মতানৈক্য স্বাভাবিক। কারণ প্রতি একলক্ষ মানুষের মধ্যে ১০জন আক্রান্ত হলে রোগতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আক্রান্ত 'কম' নাকি 'সহনীয়' নাকি 'বেশি'? সম্ভবত রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞেরা এ প্রশ্নের সম্ভাব্য সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। তবে আমাদের মতো আমজনতা যুক্তি দেখাতে পারে যে ঐসব 'কম', 'সহনীয়', 'বেশি' নির্ভর করতে পারে জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর। অর্থাৎ ঢাকার ছোট একটা বস্তিতে যেখানে মানুষ গাদাগাদি করে বসবাস করেন সেখানে ঐ সংখ্যাটি 'বেশি'। আর যেখানে একলক্ষ মানুষ দশ বর্গকিলোমিটারে মোটামুটি সমান দূরত্বে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছেন সেক্ষেত্রে ঐ একই সংখ্যাটি 'কম' বলে বিবেচিত হলেও হতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো কোথায় কতটুকু জোর দিতে হবে। সেইসাথে এ কথাও বলতে পারবো যে একই দেশের মধ্যে মানুষ চলাচলে কোথাও কোথাও একধরনের বর্ডার বা বেড়াজাল বানাতে হবে—অস্থায়ীভাবে হলেও। আর যদি ঐ বিস্তার-এর সাথে 'কম', 'সহনীয়', 'বেশি'-র কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে জোর দিতে হবে সর্বত্র। সেক্ষেত্রে সম্পদও সে অনুযায়ী বেশি লাগবে। এসব নিয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হলো "কম-সহনীয়-বেশি"— এসব বিবেচনা যতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তার চেয়ে বহুশতগুণ গুরুত্বপূর্ণ হলো রোগের বিস্তার রোধ করতে হবে এবং বিস্তার-গতি কমাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন হবে আত্মঘাতী।

আগেই বলেছি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা হতে হবে সম্মিলিত উদ্যোগে। তবে বিষয়টি যেহেতু মহামারি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সেহেতু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আর সেক্ষেত্রে প্রচলিত গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা অসমন্বিত ব্যবস্থাপনা অথবা বহু অনভিপ্রেত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বলিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ফল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করা—যা প্রচলিত গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

কঠোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মত হলো পৃথিবীর অন্যান্য সফল দেশের মতো আমাদের দেশেও কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য মূল দায়িত্ব দিতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক

মনোনীত একজন জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে যিনি জনগণের পক্ষে সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি হবেন আর অন্যসব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর থাকবে একক দায়িত্বপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তির অধীন এবং সম্পূর্ণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সমন্বয় ও পরিচালনের জন্য তিনি জরুরি অবস্থা বা ইমারজেন্সি বিবেচনায় প্রয়োজনে সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা-জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকলের নিঃশর্ত সর্বাত্মক সহায়তা নেবেন। এ যুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হবেন চিফ অব কমান্ড আর একক দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিটি হবেন চিফ অব অপারেশনস। এর কোনো বিকল্প নেই।

করোনাভাইরাস-১৯ একদিকে যেমন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না, ঠিক অন্যদিকে করোনাভাইরাস-এর বিস্তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোধ হবে না। মনে রাখা দরকার যে বিশ্বে করোনাভাইরাস-১৯ এ যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রথম ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন প্রথম ৬৭ দিনে, পরবর্তী ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী ১৪ দিনে, তার পরের ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী মাত্র ৪ দিনে। এ তথ্যই বলে দিচ্ছে যে, কোনো সময়ক্ষেপণ না করে প্রতিরোধ বেড়াজাল তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। ইতোমধ্যে যেসব দেশ কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। এ নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়াদি নির্ধারণ করবেন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিফ অব কমান্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় একক দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্ঞানসমৃদ্ধ-দেশপ্রেমিক ওই ব্যক্তি যিনি হবেন চিফ অব অপারেশনস, যার অধীনস্থ হবে সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর-হাসপাতাল-চিকিৎসাকেন্দ্র-ল্যাবরেটরি এবং তার হাতেই ন্যাস্ত থাকবে সর্বময় কর্তৃত্ব একইসাথে তার থাকবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের একগুচ্ছ নিবেদিতপ্রাণ উপদেষ্টা।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কোনোরকম কালক্ষেপণ না করে সতেরো কোটি মানুষের আমাদের দেশে যা দরকার তা হল: পিসিআর বা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন ম্যাসিনে মলিকুলার ডায়াগনোসিস এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রি-এজেন্ট যেন প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ হাজার টেস্ট করা সম্ভব হয় (এ মুহূর্তে আমাদের দেশের তুলনায় অর্ধেক জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে প্রতিদিন টেস্ট হচ্ছে ৭০ হাজার); দ্রুত বা র‍্যাপিড টেস্টের জন্য কমপক্ষে ২ লক্ষ রোগ নির্ণয় কিট– যে কিটের কার্যকারিতা ইতোমধ্যে শতভাগ প্রমাণিত (অর্থাৎ পরীক্ষামূলক কোনো কিট নয়); সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, ল্যাব-বিজ্ঞানী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান-কর্মীবাহিনী নিয়োগ; নির্ণীত রুগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ভেনটিলেটর, অক্সিজেন এবং গুরুতর রুগীর জন্য ডেডিকেটেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউ ব্যবস্থা; প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রুগীর কফ্-রক্ত ইত্যাদি বহনের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোল্ড চেইন ব্যবস্থা; দেশের ভেতরেই সংশ্লিষ্ট যেসব উপাদান-উপকরণ আছে তার পূর্ণ ইনভেনটরি; রোগতত্ত্বীয় ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ডাটা বেইজ প্রতিষ্ঠা ও তা সংরক্ষণের ত্রুটিহীন নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থা; হাসপাতাল-চিকিৎসাকেন্দ্রে রুগীদের ঢোকা এবং বেরুনোর জন্য রোগের ধরন অনুযায়ী (যাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ইন এন্ড আউট)–সংক্রমিত রুগী, সংক্রমণ-সম্ভাব্য রুগী, অসংক্রমিত রুগীর ঢোকার জন্য তিনটি ভিন্ন পথ আর বেরুনোর সময় সংক্রমিত রুগী ও অসংক্রমিত রুগীর জন্য দুটো ভিন্ন পথ; মানব স্বাস্থ্য, জীবজন্তু ও পরিবেশ স্বাস্থ্যের ডাটা ইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা; জনস্বাস্থ্যের সাথে জন নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন; চিকিৎসক-স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের জন্য পরীক্ষিত নিরাপত্তা পরিধেয় এবং প্রণোদনাব্যবস্থা; কার্যকর সঙ্গরোধ ব্যবস্থা; স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি যে কোনো মূল্যে কঠোরভাবে পালনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা; সামাজিক মেলামেশা রোধ; ভাইরাস প্রতিরোধী সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা; বিদেশ থেকে রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ-ডাক্তার-নার্স আনা; অসংক্রমিত রোগ যেমন ক্যানসার, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস– যেসব রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে দেশে প্রতিবছর ৫০ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্রদের কাতারে যুক্ত হচ্ছেন– এসব রোগের চিকিৎসা চালু রাখা; চালু রাখা গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর চিকিৎসা সেবা; গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা যে করোনাভাইরাস আক্রান্ত মানুষের কো-মরবিডিটি অর্থাৎ অন্য রোগে আক্রান্ত মানুষ যদি করোনাভাইরাসের কবলে পড়েন সেক্ষেত্রে তার মৃত্যুসম্ভাবনা অথবা গুরুতর অসুস্থ হবার

সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা সাজানো। এককথায় দরকার হলো সমগ্র স্বাস্থ্য সেক্টর ও জনস্বাস্থ্য সেক্টরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া ও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা।

করোনাভাইরাস-১৯-এর বিস্তার রোধে যেসব কর্মকাণ্ডের কথা বললাম তা বাস্তবায়নে সম্পদ ব্যয় করতে হবে। অর্থ লাগবে। সম্ভাব্য কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ (ব্যয় নয়) করতে হবে এবং ওই অর্থ আহরণের উৎস কি হতে পারে? আগেই বলেছি হিসেবটি খন্ড চিত্রভিত্তিক নয় সমগ্রক চিত্র বিবেচনায় রেখেই করতে হবে। এ ধরনের কল্পচিত্র অনুযায়ী আমার হিসেবে প্রয়োজন হবে কমপক্ষে ১ লক্ষ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ অর্থ একইসাথে এখনই প্রয়োজন হবে না, কারণ বেশ কিছু জিনিষপত্তর যেমন রি-এজেন্ট, বেতন-ভাতা, পরিবহন ব্যয়– এসব সামনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাগবে। আনুমানিক ১ লক্ষ কোটি টাকার এ বিনিয়োগ কোথা থেকে আসতে পারে? আমার জানামতে বৈশ্বিকভাবে ইতোমধ্যে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ তহবিল গঠন করা হয়েছে যা আক্রান্ত দেশগুলো ব্যবহার করবে, আর পাশাপাশি এ বাবদ প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট ও চ্যারিটি সংস্থা। অর্থাৎ এ মুহূর্তে করোনা প্রতিরোধে বৈশ্বিক তহবিলে আছে কমপক্ষে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (এ অঙ্ক বাড়বে)। যৌক্তিক কারণেই বৈশ্বিক জনসংখ্যা অনুপাতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা হওয়া উচিত ওই ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কমপক্ষে ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ন্যায্যত আমাদের পাওনা হতে পারে কমপক্ষে ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। এ হিস্যা পেতে হলে প্রয়োজন হবে শক্তিশালী অতি জরুরি ফলপ্রদ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রেও ভ্যানগার্ড হতে পারেন বিশ্ব সমাজে আদৃত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈশ্বিক তহবিল থেকে ওই অর্থ পাওয়া গেলে ঘাটতি থাকবে ৮৭ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। ঘাটতি এ অর্থ পূরণের উৎস হতে পারে জরুরি অবস্থায় সম্পদশালীদের উপর কর অর্থাৎ ওয়েলথ ট্যাক্স আরোপ (৩০ হাজার কোটি টাকা), পাচারকৃত অর্থ ও কালো টাকা উদ্ধার (৬০ হাজার কোটি টাকা)। এখানে অর্থনীতিশাস্ত্রের কয়েকটি প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য কথা উল্লেখ জরুরি: ওয়েলথ ট্যাক্স বৈষম্য হ্রাস করে; অর্থ পাচার ও কালো টাকা বৈষম্য বাড়ায়; সম্পদশালীদের উপর ট্যাক্স কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না; সমাজের নীচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের উপর ট্যাক্স কমালে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে।

করোনাভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে এই ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ ফল হবে বহুমুখী পজিটিভ–স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদেই। স্বল্প মেয়াদে আক্রান্ত মানুষ বাঁচবে, সংক্রমণ হার কমবে, সংক্রমণ বিস্তার রোধ হবে, কম্যুনিটিতে ছড়িয়ে যাওয়া কমবে, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, মানুষের মানসিক দুশ্চিন্তা উদ্ভুত দুর্দশা কমবে, কো-মর্বিডিটি (সহ অসুস্থতা) কমবে একই সাথে কমবে সংশ্লিষ্ট মৃত্যু হার। আর দীর্ঘমেয়াদে লাভ হবে অনেক সুদূরপ্রসারী: ভাইরাস প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। সমগ্র স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে, বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী আমাদের অবস্থান বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম, যেখানে রোগ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সূচক জীবাণু বাহিত অসুখ-বিসুখ, বায়ো-সিকিউরিটি, বায়ো-সেফটি, জীবাণু কন্ট্রোল প্রাকটিস ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, স্বাস্থ্য সিস্টেম, র‍্যাপিড রেসপনস, রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং–এসব সূচকে আমাদের অবস্থান বেশ তলার দিকে। ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নততর করবে যার অভিঘাত হবে কল্পনাতীত পজিটিভ এবং বংশপরম্পরা। নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বলয় দৃঢ়তর হবার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জনস্বাস্থ্যসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক বলয় সুসংহত হবে; দৃঢ়তর হবে সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা সুশাসনের পূর্বশর্ত; দুর্বল প্রতিষ্ঠান সবল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে যা টেকসই প্রবৃদ্ধি ও প্রগতি নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত; ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য এ বিনিয়োগ হবে উপরি পাওনা অর্থাৎ তখন তাদের এ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন পড়বে না শুধু রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। এ বিনিয়োগ সুস্থ মানব সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি সুপ্রশস্থ করবে যা ভবিষ্যতে জন-সমৃদ্ধি ও মানবকুশলতা নিশ্চিত করবে। এক কথায় এ হল সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের আবশ্যিক বিনিয়োগ।

আসা যাক আমার দ্বিতীয় বর্গের বক্তব্যে যেখানে আমি বলেছি "ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব"। সম্ভাব্য অপরিমেয় ক্ষতিটা হতে পারে কিভাবে? মানুষের অকাল মৃত্যু ও বিভিন্ন মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কথা তো আগেই বলেছি– এসব হলো প্রথম ক্যাটাগরির ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ক্ষতিটা হবে একই সঙ্গে পাশাপাশি তবে ক্ষতির রূপটা হবে ভিন্ন এবং সম্ভবত ক্ষতির গভীরতা হতে পারে কল্পনাতীত ও অপরিমেয়। বিষয়টার উদ্ভব হবে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা গতি স্লথ হয়ে যাবার কারণে। ইতোমধ্যেই আমরা এসব লক্ষ্য করছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায়: শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (বিশেষত বস্ত্র, গার্মেন্টস, লেদার ইত্যাদি); বন্ধ হচ্ছে সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট; বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাত– রিক্সা, ভ্যানসহ শহর-উপশহর-গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা জীবিকা নির্বাহি কর্মকাণ্ড; বেকারত্ব বাড়ছে এবং বাড়বে–সর্বত্র; কৃষক কৃষিজ ফসল বিক্রির জন্য হাটবাজারে যেতে পারছেন না, কারণ করোনার কারণে হাট বসতে দেয়া হচ্ছে না; বৈদেশিক বাণিজ্যে-আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই কমছে; ইতোমধ্যে বস্ত্র ও গার্মেন্টসের প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার-এর ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে; ব্যাংকের এলসি প্রায় স্থবির; প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমে আসছে– এসবই বড় ধরনের অনিশ্চয়তা এবং এ অনিশ্চয়তা কতদিন চলবে তা কেউই জানে না। আমার মতে এসব কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টা সমাগত– এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই সম্ভবত– তা হল হয়তো বা খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি থাকবে না কিন্তু গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, তারা সন্তান-সন্ততিসহ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন। কারণ যেসব মানুষ (খানা) 'দিন আনে দিন খায়' তাদের 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে গেলে তারা খাবেটা কি? আর কাজ না থাকলে তো 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে যাবে।

এ এক সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো ক্ষুধার্ত-অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে অর্থ থাকুক বা না থাকুক তাদের চুলায় নিম্নতম প্রয়োজনমত খাবার থাকতেই হবে। সরকারি পরিসংখ্যানুযায়ী এসব মানুষের সংখ্যা ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ৩ কোটি ৪০ লাখ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না তখন এসব মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়াবে আনুমানিক ৬ কোটি। অর্থাৎ এরা হলেন দেশের মোট খানার আনুমানিক ৩৭ শতাংশ। এই ৬ কোটি মানুষ বাস করেন আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ খানায়। যার মধ্যে গ্রামে ১ কোটি খানা আর শহরে ৫০ লক্ষ খানা।

যদি করোনাভাইরাস-১৯ অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয় তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। আসা যাক কিছু হিসেবের কথায়। মূল কথা হল এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত প্রতিটি মানুষকে খাদ্য বাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে (হিসেবটি করা হয়েছে খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর দারিদ্র্যের নিম্নরেখার সাথে মূল্যস্ফিতি যোগ করে)। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারা দেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছয় মাস চালাতে হলে লাগবে ৮১ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য অনিশ্চিত এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অঙ্ক কম-বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য যেখানে শিল্প মালিকদের জন্য আপাতত ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আর্থিক ও নীতি সুবিধাসহ আরো অনেক সুবিধে দিতে হবে সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষ বাঁচাতে তাদের মধ্যে খাদ্য বাবদ ছয় মাসের জন্য ৮১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ যে কোনো বিবেচনায় ন্যায্য বরাদ্দ। আবার ঐ বরাদ্দ ফল কিন্তু পরবর্তীকালে পুঁজির মালিকরাই আনুপাতিক বেশি হারে ফেরত পাবেন কারণ তাদের দরকার হবে সুস্থ শ্রমিক। আর ঐ সুস্থ শ্রমিকরাই দেশজ উৎপাদন বাড়াবেন এবং একই সাথে সত্যিকার অর্থে সুস্থ থাকলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে–বাড়বে প্রবৃদ্ধি। শেষ বিচারে আনুপাতিক হারে এ সবের বেশি অংশের ফল ভোগ করবেন পুঁজির মালিক ও তাদের স্বার্থবাহীরা।

সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দপ্রাপ্তি যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ন; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগবিহীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এখনই। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময় নির্ধারিত। তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হলো গ্রাম এবং শহরে যেসব খানা নারীপ্রধান যার প্রায় শতভাগই আর্থিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তালিকাভুক্ত হবেন (তবে কেউ সংগত কারণে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইলে তাকে বাদ দেয়া উচিত), তালিকাভুক্ত হবেন সরকারি হিসেবের সব দরিদ্র খানা, সে সব খানা যাদের কোনো সদস্য মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে পারেননি অথবা পারছেন না, এবং সেসব খানা যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো আবাসন নেই এবং গৃহহীন খানা, শহরের বস্তিবাসী এবং ভাসমান মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট অংশ, করোনা আক্রান্ত অথবা সম্ভাব্য আক্রান্ত সকল দরিদ্র খানা, চর-হাওড়-বাওড়-এর মানুষ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এবং যারা ইতোমধ্যে বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি পাচ্ছেন তাদের বাদ না দেয়া। এ তালিকা প্রণয়নে দল-মত-গোষ্ঠী-সমাজ যেন কোনোভাবে প্রভাব না ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে, মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

এর পরের প্রশ্ন— তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা খাবার কিভাবে পৌঁছাবে? বরাদ্দকৃত অর্থ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং অথবা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে একই খানার জন্য যেন শুধুমাত্র একটি (একাধিক নয়) মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও ফলপ্রদ সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী অথবা সামাজিক সেফটি নেট কর্মসূচীর মাধ্যমে যে শতাধিক ধরনের বরাদ্দ মানুষের কাছে পৌঁছায় সেটা অনুসরণ করা যেতে পারে। খাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা বরাদ্দকৃত খাদ্য সরাসরি পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিলি-বণ্টন ও মনিটরিং ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নেবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জনগণের সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা-শৃংখলা ও আইনী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। কেন্দ্রিয়ভাবে রিপোর্ট যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীতি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে যিনি প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে সরাসরি রিপোর্ট করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চিফ অব কমান্ড হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানীত ব্যক্তিটি হবেন চিফ অব অপারেশনস। অর্থাৎ সমগ্র মেকানিজম হবে মোটামুটি "করোনাভাইরাস-১৯ প্রতিরোধ" কার্যক্রম যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে ঠিক একই ধরনের গুরুত্ব দিয়ে।

এখন প্রশ্ন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বাঁচাতে ছয় মাসের খাদ্য-সহায়তা বাবদ যে ৮১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ লাগবে তা কোথা থেকে আসবে? এ প্রশ্নের পাটিগাণিতিক উত্তর তেমন কঠিন নয়।

আমাদের চলমান ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা হল উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। মোট ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সর্বমোট যে পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয় তার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় প্রথম ১০ মাসে। আর পরের দুই মাস অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি প্রবল অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় মিস-এলোকেশন অথবা অপচয়। এ হিসেবে চলমান উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ এখনও ব্যয় হয়নি। বরাদ্দকৃত অ-ব্যয়িত এ অর্থের মোট পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৮৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই যে আগামী

দুইমাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অথচ অ-ব্যয়িত একাংশ ব্যয় হতেই হবে (যেমন খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ন, মহিলা ও শিশু, জনশৃংখলা) সেক্ষেত্রেও বর্তমান জরুরি অবস্থায় ওই অ-ব্যয়িত অংশের সর্বোচ্চ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়কে যুক্তিসঙ্গত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ তার পরেও হাত থাকবে ৭৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। এ মুহূর্তে যে কাজটি করা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই উল্লেখিত ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে খাত-উপখাতওয়ারি এ তথ্যাদি জেনে নিন যে প্রত্যেকের কাছে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অথচ এখনও ব্যয় হয়নি এমন অর্থের পরিমাণ কত; নির্দেশনা দিন আগামী ২ মাসে ব্যয় না করলেই নয় এমন খাত-উপখাতগুলো কি কি এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি। দেখবেন অর্থের অভাব তো হবেই না, বরঞ্চ অর্থ বছরের শেষের দিকে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' উল্টে যাবে। এটাও তো হতে পারে কোভিড-১৯-এর কারণে বহুদিনের পচনশীল বাজেট বাস্তবায়ন সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এ সবের পাশাপাশি দেশের মধ্যেই সরকারি রাজস্ব অর্থাৎ অর্থ-আহরণের বহু উৎস আছে যাতে কখনো হাত দেয়া হয়নি, যেমন গত বাজেট বক্তৃতায় (২২১ অনুচ্ছেদে) মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন "বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই...। অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না"। একইসাথে সামনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধ-পরবর্তী সময়ে খাদ্য-সহায়তা, কর্মসৃজন-সহায়তা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়তার লক্ষ্যে বহু ধরনের বৈশ্বিক তহবিল গঠিত হবে। আগেই বলেছি জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমরা এসব তহবিলের ৩ শতাংশ হিস্যা পেতে পারি। তাহলে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ৬ মাসের খাদ্য সহায়তা বাবদ ৮১ হাজার কোটি টাকা আহরণ আদৌ কোনো কঠিন কাজ হবে না।

আগেই বলেছি মানুষের 'কাজ' না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে করি 'কাজ' নিয়ে নিরাশ না হয়ে পথ-পন্থা খুঁজতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় কেইনসীয় সমাধান পথ যথেষ্ট কার্যকর। আর তা হল অবস্থা একটু উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারী বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কর্মকাণ্ড চালু করা। হতে পারে তা রাস্তার কাজ, নির্মাণ কাজ, নদী খননের কাজ, পুকুর-দিঘী খননের কাজ, স্কুল ঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। কাজ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে হবে। কাজ নিয়ে উদ্ভাবনের স্বরূপ সময়ই বলে দেবে।

আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেশন বরদাস্ত না করা। অতীতের ইতিহাস বলে সিন্ডিকেটওয়ালারা বিভিন্ন অজুহাতে অযথা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য বাড়িয়ে বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন। ফলে মানুষ দরিদ্রতর হয় এবং বৈষম্য বাড়ে। করোনা আক্রান্তকালে ও পরবর্তী কিছুকাল এসবের সম্ভাব্য মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে যদি শক্ত হতে তা দমন না করা যায়। এ ধরনের সবকিছু ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আর এ সবের পাশাপাশি এ মুহূর্তে (মার্চ-এপ্রিল) যে সব চৈতালি ফসল মাঠে আছে অথচ কৃষক হাটবাজারে বিক্রি করতে পারছেন না, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল, গম, মরিচ আর সামনে (মে মাসে) যে ফসল উঠবে যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি সেসব যেন সরকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মধ্যস্বত্বভোগিদের দৌরাত্ম্য দূর করার এটাও এক সুযোগ। অন্যথায় কৃষক আবারও মধ্যস্বত্তভোগীদের অধীনস্থ হবে আর রাজত্ব করবে সিন্ডিকেটওয়ালারা। এ সবই দমন করতে হবে–কঠোর হাতে।

আমার প্রস্তাবিত 'মানুষ বাঁচাও' কল্পচিত্র কর্মসূচিতে আরো দু'একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি: কৃষি খাতকে সবচেয়ে অগ্রাধীকারযোগ্য খাত হিসেবে বিবেচনা করে তদনুযায়ী যতদিন করোনাভাইরাস ও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আমরা মুক্ত না হচ্ছি ততদিন কৃষিখাতে সব ধরনের উৎপাদন প্রণোদনা থেকে শুরু করে ঋণ মওকুফ, ক্ষুদ্র ঋণের সুদ মওকুফ, স্বল্প সুদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিনাসুদে কৃষি ঋণ প্রদানসহ কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির সকল কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু রাখতে হবে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের

বাজেট প্রণয়ন কর্মসূচি ইতোমধ্যে করোনাভাইরাস-১৯-এ আক্রান্ত হবার আগেই শুরু হয়েছে। আগামি বাজেটে করোনা ভাইরাস-১৯ এর ঘাত-প্রতিঘাতসহ সংশ্লিষ্ট 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচীর অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাজেটের প্রচলিত-গতানুগতিক কাঠামো পরিবর্তীত হবে। অর্থনীতি আবারও জেগে উঠবে কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে পড়বে অনেক খাত-ক্ষেত্র-শিল্প-ব্যবসা।

ইতালিসহ কিছু দেশে ব্যাংকিং সংকটের আশঙ্কা আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার আঘাত ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান একই সাথে এ মুহূর্তে ৩০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বেকারত্ব-ইন্সুরেন্স দাবি করছেন– যা বাড়বে; গণচীনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৩.৫ শতাংশ কমেছে; যুক্তরাজ্যে করোনার আঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে–সব মিলিয়ে বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে; সম্ভবত পরিবর্তীত হতে যাচ্ছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ ও মেরুকরণ। আমরা এসব ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাত থেকে মুক্ত নই। সুতরাং আমাদেরও ভাবতে হবে– কঠিন ভাবনা কারণ 'অনিশ্চয়তার' মধ্যে সুস্থ ভাবনা শুধু মানসিকভাবেই নয় যৌক্তিক কারণেই সহজ নয়। জটিল এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথরেখা বিনির্মাণে ধৈর্য, সততা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মিলনের বিকল্প নেই। আমরা এখন যে সময় পার করছি তার প্রাক-অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। অনিশ্চিত সময়টা হল "ডিজিটাল সংযোগের যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট।" সুতরাং মানব উন্নয়ন সংশিষ্ট সকল চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনায় এ বিষয়টি মূল নীতি-কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আমার আপাত শেষ কথা: করোনাভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির যে কল্পচিত্র প্রস্তাব করেছি তা যথেষ্ট মাত্রায় যৌক্তিক। কারণ একদিকে যেমন মানুষকে ভাইরাস থেকে প্রতিরোধ করতে হবে তেমনি অন্যদিকে কোনোভাবেই দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করা যাবে না এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরাতে হবে। আমরা এসব মোকাবেলায় সক্ষম। কারণ আমাদের নেতৃত্বের শিখরের ব্যক্তিটির মানবিক দায়বোধ সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। আর এসব মোকাবেলা করতে সক্ষম হলে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-প্রভাব বা স্পিল ওভার ইফেক্ট হবে উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক; শ্রম ও পুঁজির বাইরে উন্নয়নে আরো যেসব উপাদান কাজ করে তার প্রভাব হবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা; মোট দেশজ উৎপাদন-এর ভাবনা জগতে নির্ধারক স্থান করে নেবে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি অথবা জীবন-কুশলতা; অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদি ফ্যাক্টরের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাক্টর বেশি প্রভাব ফেলে–আমরা সেদিকেই এগুবো; এবং সর্বশেষ কথা আমাদের দেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে যা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি সে সব গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্বলিত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে ফলে সুশাসন নিশ্চিত হবে, নিশ্চিত হবে শুধু জবাবদিহিতা নয় মানবিক দায়বদ্ধতা। শেষ বিচারে আমরা অবশ্যই পারবো এমন এক সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বিনির্মাণ করতে যা "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"-এ দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম, যা সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে "ডিজিটাল যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট" কাটিয়ে উঠতে সক্ষম, এবং যা শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি আস্থা-সম্মান রেখে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি ও জীবন-কুশলতা বাড়াতে সক্ষম।

[লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক ও গবেষক। অধ্যাপক, অর্থনীতি ও জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।]

করোনা ভাইরাস নিয়ে নানান কথামালা

রা হ মা ন চৌ ধু রী

গত শতকের স্পেনিশ ফ্লু আর বর্তমানের করোনা ভাইরাস

গত শতকের ভয়াবহ মহামারি ছিল স্পেনিস ফ্লু। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মানে পঞ্চাশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল এই ভাইরাস দ্বারা। তখন মারা গিয়েছিল দুই থেকে পাঁচ কোটি মানুষ। অনেকে ধারণা করেন মৃতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয় এ কারণে যে, তখন হাসপাতালের নথিপত্র রক্ষার ব্যবস্থা সেরকম ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে উনিশশো আঠারো সালে এই ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে আর প্রথম মহাযুদ্ধে যত মানুষ মারা গিয়েছিল, স্পেনিশ ফ্লুতে মারা যায় তার চেয়ে বেশি মানুষ। প্রথম মহাযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ধরা হয় এক কোটি সত্তর লক্ষ। প্রায় দেড় বছর ধরে 'স্পেনিশ ফ্লু' নামের এই ভাইরাসের সংক্রমণ চলে। যুক্তরাষ্ট্রেই সেবার ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। জানা যায় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তখন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন যখন যুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তির আলোচনা চলছিল। সেই দিনগুলোতেও এর সামান্য চিকিৎসা ছিল না, ঠিক তখনো সকলকে মাস্ক পরে থাকতে বলা হয়েছিল। যথেষ্ট আক্রান্ত এলাকাগুলোতে সে সময়ে দোকানপাট, হাটবাজার, সিনেমা হল, গির্জা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ ছিল। শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে তখন প্রধানত এটা সংক্রমিত করত। ঠিক একইভাবে মানুষ হাত দ্বারা কিছু স্পর্শ করলে আর তার সেই হাত চোখ-মুখ-নাক স্পর্শ করলে স্পেনিশ ফ্লু'র ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হতে পারত। সেই সময়ে ভাইরাসটি অধিক বিপজ্জনক ছিল ডায়াবেটিক রোগী, হৃদরোগী আর শ্বাসতন্ত্রের রোগীদের ক্ষেত্রে। বর্তমান করোনা ভাইরাসের সঙ্গে এসব ব্যাপারে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে স্পেনিশ ফ্লু ভাইরাসের।

যদিও এটাকে স্পেনিস ফ্লু বলা হয়ে থাকে কিন্তু তার উৎপত্তিস্থল স্পেন ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলোর মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু জন আক্রান্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধরত দেশের শাসকরা মনে করল, এ খবর প্রচার হয়ে পড়লে একটা আতঙ্ক দেখা দেবে এবং যুদ্ধরত দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সেজন্য যুদ্ধরত দেশগুলো এ সংবাদ প্রচারের ওপর কড়াকড়ি নিষেধ আরোপ করে। প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল, ফলে তার সংবাদমাধ্যমের ওপর তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় সেখানে রোগটি দেখা দিলে পত্রিকায় সে খবর প্রকাশিত হয়। মাদ্রিদের পত্রিকায় এ খবরটি প্রথম ছাপা হলে, এই রোগ স্পেনিশ ফ্লু হিসেবে প্রচার পেয়ে যায়। কিন্তু পরে স্পেন মনে করতে শুরু করে ভাইরাসটির প্রথম উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ফ্রান্স, ফলে সেটাকে 'ফ্রেন্স ফ্লু' নামকরণ করে স্পেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়ে কেউ বলতে পারেননি ভাইরাসটির উৎপত্তিস্থল কোনটি– ফ্রান্স, চীন, ব্রিটেন নাকি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু স্পেন যে নয় এ ব্যাপারে সকলে নিশ্চিত, কারণ তার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এ রোগ শনাক্ত করা হয়। প্রথম রোগী শনাক্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে সামরিক বাহিনীর মধ্যে উনিশশো আঠারো সালের এগারই মার্চ। বহু জন মনে করতে শুরু করে সৈনিকেরা এই রোগ ছড়িয়েছিল। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যেত। যুদ্ধের কারণে তখন সৈন্যদের একসঙ্গে চলতে হত, ফলে এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সেনাবাহিনী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে পরে বিধ্বস্ত ইউরোপে যে রকম অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল সে প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র বহু দেশকে ঋণ প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র তখন পৃথিবীর সর্বশক্তিমান দেশ। ইউরোপের দেশগুলো যুদ্ধশেষের নানা বিপর্যয়ে এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী ছিল। ফলে যা 'স্পেনিশ ফ্লু' নামে পরিচিত সে রোগটি যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপের পক্ষে কণ্ঠ উঁচু করে সে-কথা বলার সুযোগ ছিল না। ফলে শেষ পর্যন্ত রোগটির নাম 'স্পেনিশ ফ্লু' হয়েই রইল। স্পেন দায়ী না হলেও দোষ তার ঘাড়েই পড়ল ঘটনাচক্রে।

যখন এই ভাইরাস বিশ্বের চল্লিশ শতাংশ মানুষকে আক্রান্ত করে তখনো এর কোনো চিকিৎসা ছিল না। মহাযুদ্ধের কারণে তখন বিভিন্ন দেশে প্রচুর চিকিৎসক মারা গিয়েছিল। যুদ্ধের কারণে বহু হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছিল। ফলে স্পেনিশ ফ্লু নিয়ে খুবই ভয়াবহ বিভৎস সময় পার করছিল মানুষ। যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মূল হাসপাতালগুলোর অধিক সংখ্যক বিধ্বস্ত হওয়ায় বিভিন্ন ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন করে হাসপাতাল বানানো হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রোগীদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ভিন্ন দিকে 'কোয়ারেন্টাইন' ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছিল। চার্চিল নিজেও এ সময়ে 'কোয়ারেন্টাইন'-এ ছিলেন। রাস্তায় কেউ থুথু ফেললে রোগ ছড়াতে পারে সে বিবেচনায় রাস্তায় কেউ থুতু ফেললে জরিমানা করা হত। যদিও ওষুধ ছিল না, কিন্তু বায়ার কোম্পানির 'অ্যাসপিরিন'কে তখন ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম এটা ব্যবহার শুরু হয়েছিল, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর সার্জন জেনারেল এবং 'জর্নাল অফ দ্য আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' এই ওষুধটা ব্যবহারের পক্ষে কথা বলে। তাদের পরামর্শ ছিল প্রতিদিন রোগীকে ত্রিশ গ্রাম অ্যাসপিরিন দিতে হবে। পরবর্তীকালে এটাকে অতিরিক্ত ডোজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে তখন প্রচুর রোগীর মৃত্যু হয়েছিল অ্যাসপিরিনের বিষক্রিয়ায়। মনে করা হয়, সে চিকিৎসাটি সঠিক ছিল না। নিশ্চয় 'বায়ার' নামক ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিছু কিছু চিকিৎসক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই 'বায়ার' নাজি হিটলারকে প্রচুর অর্থসহায়তা দিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে সৈন্যরা ফিরে এলে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহভাবে স্পেনিশ ফ্লু ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া তখন গা করেনি এই রোগটিকে নিয়ে। সেখানকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মতোই বলেছিল, এটা একটা সাধারণ জ্বর বা ফ্লু। ফলে সেপ্টেম্বরের আটাশ তারিখে যুদ্ধ শেষে শহরের বিজয় প্যারেড দেখতে দশ হাজার লোক যোগদান করে আর তা ভয়াবহ রকমভাবে রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। সেই ঘটনার দশ দিনের মধ্যে এক হাজারের বেশি মানুষ মারা যায় এবং দু'লাখ মানুষ সংক্রমিত হয়। ফিলাডিলফিয়ার কর্তৃপক্ষ তখনি সবকিছু বন্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তী বছরের মার্চের মধ্যে ফিলাডেলফিয়ায় পনেরো হাজার মানুষ এই রোগে মারা গিয়েছিল। বহুরকম বিপর্যয় ঘটিয়ে, বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে বিশ্বব্যাপী উনিশশো উনিশ সালের গ্রীষ্মকালে স্পেনিশ ফ্লু'র সংক্রমণ বন্ধ হয়। প্রাকৃতিকভাবেই তা ঘটেছিল, চিকিৎসার দ্বারা নয়। হয় মানুষ ততদিনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল না-হলে শরীরে ততদিনে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্পেনিশ ফ্লু'র প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছিল উনিশশো চল্লিশ সালে। স্পেনিশ ফ্লু'র ভয়াবহ আক্রমণে মানুষ কোনো ওষুধ এবং কোনো 'ভ্যাকসিন' ছাড়াই পৃথিবীতে টিকে রইল অনেক মর্মান্তিক ঘটনার ভিতর দিয়ে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ আর ঠিক তার সমসাময়িক এই মহামারিকে ঘিরে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়নি। নিঃসন্দেহে যুদ্ধ শেষে খাদ্যসঙ্কট ছিল বিভিন্ন দেশে। যুদ্ধশেষে জার্মানিতে দেখা গিয়েছিল মুদ্রা-বিপর্যয় আর ভয়াবহ বেকারত্ব। সত্তর লক্ষ মানুষ কর্মহীন ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের দশ বছর পর মহামন্দা নেমে এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে। ঠিক তার দশ বছর পর আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি আর তা চলমান সময়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আর স্পেনিশ ফ্লু ধ্বংস করতে পারেনি সেভাবে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিকে, ঠিক বিশ বছরের মাথায় তা হলে মানুষ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে নিশ্চয় আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারত না। যুদ্ধে যেমন ব্যয় হয়, ঠিক সেভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয়ও হয় ধনীদের।

বর্তমান শতকের সার্স আর মার্স

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞান ধনসম্পদে বহু অগ্রগতি লাভ করলেও, ভাইরাস রোগের চিকিৎসায় সেভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। কথিত বিভিন্ন ভাইরাসের রোগ প্রতিরোধে চিকিৎসাবিজ্ঞান 'স্পেনিশ ফ্লু'র সময় যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, বর্তমানে বলতে গেলে প্রায় সেখানে আছেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে বিশ-একুশ শতক নানারকম বিস্ময়কর অবদান রাখলেও, ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে নতুন কোনো অবদান লক্ষ করা যায়নি। বরং বলা যায়, ভাইরাস-রোগ প্রতিরোধে উনিশ শতকের শেষপাদে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান বিশ্ব চলছে। সার্স, মার্স সব ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত হয়েছে। সার্স-যুদ্ধে লড়াই করেছেন এমন একজন ব্যক্তি ব্রেইন ডোবারস্ট্রাইন বলেন, সত্যি বলতে একুশ শতক সার্স ভাইরাস

প্রতিরোধে কম ভূমিকা রেখেছে, সার্স নিয়ন্ত্রণে উনিশ শতকের চিন্তা-ভাবনা বা প্রযুক্তি যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, উনিশ শতকের আবিষ্কার দিয়েই আমরা একুশ শতকে লড়ছি। বহুজনই কথাটা বলেছেন, বিভিন্ন বড় বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী নয়। কবে ভাইরাসের আক্রমণ হবে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা খরচ করতে চায় না, কারণ মুনাফা তাদের কাছে প্রধান কথা। স্বল্পকালীন সময় বা এককালীন সময়ে জন্য ওষুধ বিক্রিতে তেমন মুনাফা নেই। ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোও পরিচালিত হয় ধনীদের স্বার্থ দ্বারা। ফলে ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধে সেসব দেশের সরকারগুলোও খুব উৎসাহ দেখায়নি। স্মরণ রাখতে হবে, পৃথিবীর বেশির ভাগ ধনী দেশ চিকিৎসাসেবা দেয় না, চিকিৎসা বিক্রি করে।

ফলে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা বন্ধই ছিল বলা যায়। ভাইরাসের আক্রমণ হলে তখন কিছুটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনা লক্ষ করা যায় মাত্র সরকারগুলোর মনোভাবে। কিন্তু সুদূর লক্ষ্য নিয়ে ভাইরাস প্রতিরোধে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বিশ্বের কর্তাব্যক্তিদের। ফলে সার্স রোগের আক্রমণেও বিশ্ব দিশেহারা হয়েছিল। সার্স রোগ মানে 'সিভিয়ার একিউট রেসপাইরেটরি সিনড্রোম' বা সার্স রোগের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় দুই হাজার দুই সালের নভেম্বর মাসের ষোল তারিখে। চীনের গুয়ানজং প্রদেশের ফসহান শহরে সেদিন পঁয়তাল্লিশ বছরের এক যুবকের শরীরে এই রোগ সনাক্ত হয়। খুব উচ্চমাত্রার জ্বর, শুকনা কাশি আর সেইসঙ্গে তার শ্বাসতন্ত্রকে অকার্যকর করে তোলে। দুঃখজনকভাবে তার শ্বসনযন্ত্র দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে। চীন কিন্তু তখন রোগটি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অবগত করে না। যখন রোগটি প্রথম আরম্ভ হয় দেখা গেল খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, দোকানদার বা রান্নার সঙ্গে যুক্তরা সংক্রামিত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে তা স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ আক্রান্তরা যখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান তা ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের আক্রান্ত করে। যখন রোগটি চীনে ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন গুয়াজং প্রাদেশিক সরকার এগারো জানুয়ারি স্থানীয়ভাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে এই রোগটির কথা ঘোষণা করে। দুই হাজার তিন সালের একত্রিশে জানুয়ারি দেখা যায় সার্স ভাইরাস দ্বারা গুয়ানজংয়ের সান ইয়াৎ সেন চিকিৎলয়ের ত্রিশ জন স্বাস্থ্যসেবিকা সংক্রমিত হয়ে পড়েছেন। পরে গুয়াজংয়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা রোগটি নানাভাবে ছড়াতে থাকে। বিভিন্ন কারণে পরে মনে করা হয় প্রাণী থেকে এই রোগ মানুষের দেহে ছড়িয়েছিল, যা ছিল মানুষের ফুসফুসের প্রদাহঘটিত গুরুতর রোগ।

চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে রোগটি সম্পর্কে জানায় দুই হাজার তিন সালের দশ ফেব্রুয়ারি। চীনে তখন ১০৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট ৩০৫ জন আক্রান্ত আর তার মধ্যে মারা গিয়েছে পাঁচ জন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তা আরো বেড়ে যায়। দুই হাজার তিন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই রোগটি চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তার পরেই চীনের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। চীনে প্রথম রোগটি সনাক্ত হবার স্বল্পদিন পরেই গুয়ানজংয়ের সান ইয়াৎ সিন হাসপাতালের বয়স্ক একজন চিকিৎসক লিউ হংকং ভ্রমণে যান তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়েতে। তিনি কাউলনের মেট্রোপল হোটেলের নবম তলায় অবস্থান করেন যেখানে সেইসময়ে বিভিন্ন দেশের আরো অনেক ভ্রমণকারী ছিলেন। বৃদ্ধ এই চিকিৎসক নিজে তখন সার্স রোগে আক্রান্ত ছিলেন যা তিনি জানতে পারেননি। কাউলন হোটেলে অবস্থানকালে লিউ নবম তলার ৭ জন সহ মোট ২৩ জনের মধ্যে রোগটিকে নিজের অজান্তেই সংক্রমিত করেন। বাইশে ফেব্রুয়ারি যখন তাঁর নিজের রোগ ধরা পরে, লিউকে হংকংয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লিউ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে তাঁকে যেন সকলের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়। তিনি মার্চের ৪ তারিখে সেখানে মারা যান। লিউ'র মাধ্যমে তাঁর ভগ্নিপতি আক্রান্ত হন পহেলা মার্চ, তিনিও হংকংয়ের একটি হাসপাতালে মারা যান মার্চের ১৯ তারিখে।

চিকিৎসক লিউ'র এই ভ্রমণের ঘটনা থেকে রোগ চীনের মূল ভূখ-ের বাইরে হংকং থেকে আরো অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভ্রমণকারীরা তখনো কেউই জানতেন না যে তাঁরা রোগটি বহন করছেন। কাউলন হোটেলে অবস্থানকালীন অতিথিদের মধ্যে তিনজন ফিরে যান সিঙ্গাপুরে, একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একজন আয়ারল্যান্ডে আর একজন ভিয়েতনামে, দুজন কানাডায় এবং সকলেই তাঁরা রোগটিকে বহন করে নিয়ে যান। কাউলন হোটেলের বিদেশি অতিথিদের বাকি কয়েকজনকে সার্স ভাইরাসে আক্রান্তের কারণে

হংকংয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেট্রো হোটেলের সাতাশ বছরের এক অতিথি রোগীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে হংকংয়ের প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালের নিরানব্বই জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হন। ভিয়েতনামে রোগটিকে বহন করে নিয়ে যান একজন চীনা-আমেরিকান নাগরিক জনি চেন। তিনি ছিলেন মূলত সাংহাইয়ের অধিবাসী। তিনি রোগটি ধরা পড়লে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি হ্যানয়ের 'ফ্রেন্স হসপিটাল অব হ্যানয়'-এ ভর্তি হন এবং সে হাসপাতালের ৩৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে সংক্রমিত করেন। তিনি ১৩ মার্চ মারা যান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তা কার্লো ছিলেন সংক্রমণ রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি চেনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হন এবং ২৯ মার্চ মারা যান।

কানাডার একজন বয়স্ক মহিলা যিনি হংকংয়ে মেট্রো হোটেলের অতিথি ছিলেন, তিনি কানাডাতে ফিরে এসে সার্স রোগের আক্রমণে ৫ মার্চ মারা যান। তাঁর ছেলে সংক্রমিত হয়ে মারা যান ১৩ মার্চ। বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে রোগটির খবর পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে গেছে রোগটি প্রথম চীন দেশে সনাক্ত হয়েছে আর তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সঙ্গে সঙ্গে অবগত না-করার জন্য চীন সমালোচিত হয়। যদিও দুই হাজার তিন সালের জানুয়ারি মাসে গুয়ানজং প্রাদেশিক সাংবাদিক সম্মেলনে রোগটির কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু দুই হাজার তিন সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি চীন সরকার তাদের তথ্য প্রকাশ করে এবং ততদিনে চীনে তিনশো পাঁচ জন আক্রান্ত হয়েছে। চীন আরো আগে তথ্যটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে না-জানাবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়ে বলে, বিশ্বকে এ ব্যাপারে আগে সতর্ক না-করাতে রোগটির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। মার্চের বারো তারিখের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ রোগটি সম্পর্কে সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের নাগরিকদের পরামর্শ দেয় আক্রান্ত দেশ বা অঞ্চলগুলো ভ্রমণ না-করতে। দুই হাজার তিন সালের ফিফা-র মহিলা বিশ্বকাপ সে কারণে চীন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। আইস হকির মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা বাতিল করা হয়। বিভিন্ন আক্রান্ত দেশগুলো সভা-সেমিনার আন্তর্জাতিক সম্মেলন– এসব স্থগিত করে। চীন-সহ আক্রান্ত অঞ্চলের খাবারের দোকানের ব্যবসা সবচেয়ে বেশি লোকসান দিয়েছিল। হংকংয়ের পর্যটন ব্যবসায় বিপর্যয় ঘটেছিল।

সার্সের লক্ষণ ছিল অন্যান্য ফ্লু'র মতোই। উচ্চমাত্রার জ্বর, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া, চামড়ায় র‍্যাশ হওয়া, ক্ষুধামন্দা, শ্বাসকষ্ট। কিন্তু রোগটা কীভাবে ছড়াত প্রথমে বিজ্ঞানীরা খুব একটা নিশ্চিত হতে পারেননি– কিন্তু এটা নিশ্চিত ছিল রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এটা ছড়ায়। সার্সের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা প্রায় দশজন। কিন্তু সার্স ভাইরাসের লক্ষণ দু-তিন দিনের মধ্যেই ধরা পড়ত। ফলে সার্স ভাইরাস খুব লম্বা সময় ধরে নীরবে সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগ ছড়াতে পারত-না বলে, খুব বেশি মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেনি। কিন্তু তার পরেও একত্রিশটি দেশে এ রোগের সংক্রমণ ঘটেছিল। সবচেয়ে বড় সংক্রমণ ঘটে চীন আর হংকংয়ে। চীনে মোট আক্রান্ত হয়ে ৫০২৭ আর মারা যায় ৩৪ জন। হংকংয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৭০৫ আর মারা যায় ২৯ জন। তাইওয়ানে আক্রান্ত হয় ২৪৬ জন মারা যায় ৭ জন। সিঙ্গাপুরে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩৮ মারা যায় ৩ জন। যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৭ কিন্তু কেউ মারা যায়নি। সকল দেশ মিলিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছিল ৮০৯৬ জন মারা যায় ৭৭৪ জন। বিভিন্ন দেশ আক্রান্ত হলে যখন মাস্ক পরার কথা বলা হয়, কোয়ারেন্টাইনে যাবার সিদ্ধান্ত আসে ঠিক তখনি হঠাৎ রহস্যময়ভাবে ভাইরাসটির আক্রমণ কমতে থাকে। মাত্র আট মাস এই ভাইরাস তার প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। দুই হাজার তিন সালের পাঁচ জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করে যে সার্স ভাইরাসের সংক্রমণের ভয় দূর হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরেও কিছু কিছু সংক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। দুই হাজার চার সালের মে মাসের পর আর সার্স আক্রান্তের খবর পাওয়া যায় না। সার্স ভাইরাসের রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়ার কারণ এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি। সার্স আক্রমণের সময় যে সংক্রমণ রোধে যে টিকা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল তা তখন স্থগিত হয়ে যায়।

সার্স যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা মিলিতভাবে এটা প্রতিরোধ করার জন্য সমন্বিতভাবে কাজে নেমেছিলেন। ব্রেইন ডোবারস্টাইন তাঁদের একজন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি মনে

করেন, এ ধরনের ভাইরাসের আক্রমণকালে 'স্বচ্ছতা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নীতি রোগটিকে প্রতিরোধ করার জন্য'। তিনি লিখেছেন, প্রথমদিকে বহু দেশই সঠিক তথ্য দিতে চাইত না। তিনি এ কারণে বলেছেন যে, এই ধরনের সর্বগ্রাসী মহামারির ক্ষেত্রে 'বিশেষ কোনো একটি দেশের খোলাখুলি নিজেকে প্রকাশ না-করা বা দায়িত্বহীনতার পরিচয় শুধু তার নিজের দেশকেই নয়, সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।' যদিও সার্স ভাইরাসটি রহস্যজনকভাবে দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু ডোবারস্টাইন পরে খুশি মনেই লিখেছেন, সার্স ভাইরাস রুখতে নজিরবিহীনভাবে সারাবিশ্বের বিজ্ঞানীরা এক হয়েছিল। সকলে খোলামনে এবং সদিচ্ছা নিয়ে অন্যদের কাজে সাহায্য করেছে, যত দ্রুত সম্ভব তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্য জানাতে কার্পণ্য করেনি। ফলে দ্রুত ভাইরাসটির চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, বলতে গেলে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার এক সপ্তাহের মধ্যে। বিজ্ঞানের জগতে ভাইরাস রুখবার প্রচেষ্টায় সেবার প্রত্যেকে তাদের সেরাটাই দিয়েছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। তিনি আরো বলেছিলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্য হবে যদি আমার দুই হাজার তিন সালের অভিজ্ঞতা থেকে না-শিখি এবং তাকে কাজে না-লাগাই। সার্স বুঝিয়ে দিয়েছে যদি আমরা সকলে যথেষ্ট ভালো প্রস্তুতি নিয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করি তাহলে যুদ্ধটা সহজ হবে আর তখনই আমরা সংক্রমণকারী রোগগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়তে পারব। বিশ্বে এমন কোনো দেশই নেই যে সম্পূর্ণ একা এই ভয়াবহ রকম সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

সার্সের পর আবার মার্স-এর দেখা পাওয়া গেল দুই হাজার বারো সালে প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। মিডল ইস্ট রেসপাইটোরি সিনড্রোম বা মার্স আরম্ভ হয় প্রথম সৌদি আরবে। সেখানকার একজন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ দুই হাজার বারো সালের তেরো জুন থেকে জ্বরে ভোগার পর এগারো দিনের মাথায় মারা যান। তাঁর জ্বর, কাশি আর শ্বাসকষ্ট ছিল। সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখে কাতারের একজনের এমনটাই ঘটে যা সৌদি রোগীটির ঘটেছিল। সেই সময়ে ইউরোপীয় সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল তখন যে দেশগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার একটা তালিকা তৈরি করে। সে দেশগুলো হল– বাহরাইন, ইরাক, ইজরায়েল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইউনাইটেড আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন। দুই হাজার তেরো সালের জুনের মধ্যে ৫৫ জন আক্রান্তকে পাওয়া যায় যার মধ্যে ৩১ জন মারা যায়। তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের, যেমন: সৌদি আরব, জর্ডান, কাতার, আরব আমিরাতের মানুষ। ৮ জন ছিলেন ইউরোপের– ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেনের, ২ জন ছিলেন আফ্রিকার তিউনিশিয়ার। দুই হাজার চোদ্দ সালে আক্রান্ত পাওয়া গেল ২৫৫ জন। সে বছরের মে মাসের মধ্যে সংক্রমিত হল ৫৭০ জন মারা গেল ১৭৩ জন। মার্স বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও তার সংক্রমণের হার বেশি ছিল না। মনে হয় সৌদি আরবে হজ করতে এসে অনেকে নিজ শরীরে রোগটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। মার্স ভাইরাস যে শুধু মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হত ব্যাপারটা তা নয়। নিশ্চয় আক্রান্ত রোগীর খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে একজন মানুষের শরীর থেকে আর এক জন মানুষের শরীরে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মানুষ ছাড়াই অন্যভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বহু জন মনে করেন, উট থেকে মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। ফলে এ রোগ ছড়ানোর কারণটি এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। মার্স ভাইরাস কীভাবে ছড়াত বর্তমান রচনায় এটা আলোচনার প্রধান বিষয় নয়। বিজ্ঞানীদের কাজ সেটা কীভাবে মার্স ছড়াত সেটা আবিষ্কার করা। মার্স নিয়ে বক্ষ্যমান রচনায় সামান্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হল ভিন্ন একটি দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া।

যখন সার্স-২ বা কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। লক্ষ করলে দেখা যাবে সৌদ আরবের মানুষদেরকে অনেকেই মনে করে বর্বর। যদিও সেমিটিক অনেক পুরনো সভ্যতা কিন্তু তা সত্ত্বেও সৌদি জনগণ বা সৌদি আরব দেশটি নিয়ে মানুষের মনে খুব ভালো ধারণা নেই। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বলা যাবে সৌদি আরব একটি যুগান্তকারী বা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলাম ধর্মের সূতিকাগার আর ইসলামের পয়গম্বরের জন্ম যেখানে, সেই সৌদি আরব প্রথমেই কাবা শরীফ বন্ধ ঘোষণা করে। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু সকল সময় বলা হয় ইসলাম একটি কট্টর ধর্ম। বলা হয়, মুসলমানেরা অন্ধ আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ; যাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি সামান্য আগ্রহ নেই।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণে সারা বিশ্বে সবচেয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপটি গ্রহণ করে কিন্তু সেই সৌদি আরব। ধর্মীয় সমস্ত কুসংস্কারকে বাতিল করে বিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। কারো সাহস হয়নি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। ধর্ম পালন রাষ্ট্র নিষেধ করেনি, ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকলের ছিল। কিন্তু ধর্ম সৌদি আরবের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনি। স্বাস্থ্য বা মানুষের জীবন আগে, তার পরে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি। সৌদি আরবে আগামী বছরে হজ পালিত হবে না করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের কারণে। কিন্তু হজ সৌদি আরবের একটি বড় উপার্জনের জায়গা। সৌদি আরব সেটা নিয়ে সামান্য মাথা ঘামাচ্ছে না। স্বীকার করতেই হবে, করোনা ভাইরাসে আক্রমণ প্রতিরোধে সৌদি আরব বহু বিজ্ঞানসম্মত দেশের চেয়ে নিজের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছে।

বিষয়টা লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না। সৌদি আরব করোনা আক্রমণের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিল। ধর্ম পালনের নাম করে জনগণকে জমায়েত করতে দিলে যে প্রাণহানি ঘটবে, রাষ্ট্র সেটা বুঝতে পেরেছিল। রাজতন্ত্র সম্পর্কে যতই নেতিবাচক হোক মানুষের ধারণা, সৌদি রাজপরিবার জনগণের জানমাল নিয়ে যে দুশ্চিন্তা করে তার প্রমাণ রেখেছে। গণতান্ত্রিক বহু দেশ তার জনগণের নিরাপত্তা বিধানে সেটুকু করার চেষ্টা দেখায়নি। ফলে সৌদি আরবকে চট করে বর্বর বলার আগে বহু বার বিবেচনা করতে হবে, রাজতন্ত্র তার প্রজার জন্য যা পেরেছে, ভারত এবং বাংলাদেশ সহ বহু রাষ্ট্রের সরকার কি জনগণের মঙ্গলের জন্য সেরকম কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে। জনগণের মঙ্গলের জন্য সৌদি আরব ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে সামান্য পাত্তা দেয়নি। জুম্মার নামাজ, ঈদের জামাত সব বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু সকল রকম জমায়েত নিষিদ্ধ করার পরেও দেখা যাবে, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক। সাড়ে তিন কোটি মানুষের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সোয়া লাখ। যদি কাবা শরীফে নামাজ পড়া, উমরা করার অধিকার দান, জুম্মার নামাজ আদায় করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়গুলো চালু রাখা হত তা হলে আক্রান্তের সংখ্যা কত গুণ বাড়ত? ফলে সরকার যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, যখন রচনাটি তৈরি হচ্ছে তখন সৌদি আরবে আক্রান্ত জনসংখ্যা হল ১১২২৮৮ আর মৃতের সংখ্যা মাত্র ৮১৯। সৌদি আরবকে কি তাহলে বর্বর দেশ বলা যাবে? জনবিচ্ছিন্ন দেশ বলা যাবে? যখন সৌদি আরবে মৃতের সংখ্যা ৮১৯ তখন কানাডাতে আক্রান্ত ৯৭১২৫ জনের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ৭৯৬০।

মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি দেশ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। কাতারে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৩৫৯৫ আর মৃতের সংখ্যা মাত্র ৬৬। ইউনাইটেড আরব আমিরাতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০৫০৭ আর মৃতের সংখ্যা ২৮৪। কুয়েত আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৮২৩, মৃতের সংখ্যা ২৭৫। ওমানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৮৮৭, মৃতের সংখ্যা ৮৪। সবগুলো দেশের সংখ্যা যদি যোগ করে মিলিয়ে দেখা হয়, তা হলেও মৃতের শতকরা হার এক শতাংশ হচ্ছে না। দাঁড়াচ্ছে মাত্র ০.৬-এর কাছাকাছি। কিন্তু সারা বিশ্বের গড় মৃতের হার সেখানে ৫শতাংশের বেশি। সবচেয়ে বেশি মৃতের হার ফ্রান্সে প্রায় আঠারো শতাংশের বেশি, ব্রিটেনে ১৪ শতাংশের বেশি, স্পেনে ১০ শতাংশের মতো। ব্যাপারটা কি তাহলে এমন হতে পারে যে, সৌদি বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মার্স ভাইরাসের আক্রমণের পর এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল বা মার্স ভাইরাসের আক্রমণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে? না হলে এরকম সাফল্য খুব সচরাচর ঘটে না। যদি লক্ষ করি দেখা যাবে ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর সবচেয়ে বেশি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ শহর সিঙ্গাপুরে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯৩৮৭ জন হলেও মৃতের সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। ভিয়েতনামে মৃতের সংখ্যা নেই আর আক্রান্তের সংখ্যা দীর্ঘদিনেও সাড়ে তিনশোর বেশি হতে দেয়নি। বিষয়টা কি এমন কিছু যে, সার্স-১-এর অভিজ্ঞতা তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে সাহায্য করেছিল। করোনা নিয়ন্ত্রণে সব মিলিয়ে এশিয়ার সাফল্য পাশ্চাত্যের চেয়ে বহু গুণ বেশি। মৃতের সংখ্যা পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যে অনেক কম। নিশ্চয় এর কারণ নিয়ে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের গবেষণা করার সুযোগ থাকবে। মার্স সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তখনি একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে, মার্স ভাইরাসটি পরে আরো বড় মহামারি আকারে বিশ্বে আবার দেখা দিতে পারে। সে কারণে এ নিয়ে গবেষণার প্রস্তাবও রেখেছিল। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সে প্রস্তাব ধনী দেশগুলোর কাছে গুরুত্ব পায়নি। বিশ্বের ধনী দেশগুলো নিজেরাও গবেষণায় তেমন আক্রমণ দেখায়নি। কিন্তু তখন থেকে গবেষণা চালিয়ে গেলে বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বের সকল দেশকে এভাবে দিশেহারা হতে হত না।

বিশ্বে নভেল করোনা ভাইরাসের আগমন

বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাঁর 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে দেখান, সিজার নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সিনেট ভবনের দিকে যাচ্ছেন তিনি সিনেটরদের সঙ্গে, যারা সামান্য পরে তাঁকে হত্যা করবে। সিনেট ভবনে যাবার পথে সাধারণ নাগরিক আর্তেমিডোরাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে জুলিয়াস সিজারকে সাবধান করতে চায়। সিজারকে যে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে সে কথা জানিয়ে সে সিজারের হাতে একটি পত্র দিতে চায় কিন্তু সিজার তাকে পাত্তা দেন না। ঘটনার কিছু পরে সিনেট ভবনে সিজারের হত্যাকা-টি ঘটে। হয়তো নাটকের আর্তেমিডোরাস কিছুটা কাল্পনিক, কিন্তু সিজার যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজে সচেতন না-হয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণ দেন, ইতিহাসের সত্যি ঘটনা এটা। পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে সতর্কবাণীর প্রতি অনেকেই গা করেন না। খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। সেগুলো প্রায় সময় ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। পৃথিবীর অন্যতম ধনী বিল গেটস ভাইরাস দ্বারা ভয়াবহভাবে সংক্রমণ সম্পর্কে ২০১৫ সালে বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আনবিক শক্তি বা অস্ত্র নয়, ভবিষ্যতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপদ আসবে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার মাধ্যমে, যার পরিণতিতে দশ মিলিয়ন মানুষ মারা পড়তে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'মহামারি বন্ধ করার ব্যাপারে খুব কম বিনিয়োগ করছি আমরা'। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন জ্যোতিষিদের মতো নয়, বিজ্ঞানমনস্কভাবে বিশ্বের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে।

বিভিন্ন ভাইরাসের সঙ্গে ইবোলা-র আক্রমণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, ইবোলা দ্বারা ভয়াবহ মহামারি ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে কাকতালীয়ভাবে কয়েকটি সুবিধাজনক কারণে। নতুন ভাইরাসের আক্রমণে ভবিষ্যতে তেমনটা না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু বিশ্ব-নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সঙ্গতি কম আর গবেষণার ক্ষেত্রে তারা রক্ষণশীল বা আমলাতান্ত্রিক। ধনী রাষ্ট্রগুলোকে খুশি রাখতে চায় নিজেদের চাকরির সুযোগসুবিধা ঠিক রাখার জন্য। বিল গেটস ভাইরাসের আক্রমণ সম্পর্কে পরেও কয়েকবার তাঁর আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, তাতেও লাভ হয়নি। রাষ্ট্রনায়কেরা, রাষ্ট্রের মহাশক্তিধর পরিচালকেরা সহ চিকিৎসাজগতের মহারথীরা থোড়াই কেয়ার করেছে। বহু জন অবশ্য এ-রকম প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন যে, বিল গেটস তা এত নিশ্চিতভাবে জানলেন কী করে? তিনি কি চাইছেন বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ীদের পারমানবিক অস্ত্রের পেছনে টাকা না-ঢেলে মহামারি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে? কিন্তু হাতে তথ্য-উপাত্ত ছাড়া সেসব বিতর্কে যেতে চাই না। বিল গেটসের আরো আগে দু হাজার সাত-আট সালের দিকে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ একই কথা বলেছেন ভাইরাসের আক্রমণ সম্পর্কে। তিনিও বলেছেন, সামনের দিনের বিরাট বিপদ আসবে ভাইরাসের আক্রমণ দ্বারা। কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিলে নিজে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেননি।

যখন চীনে গত ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ আরম্ভ হল, চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে তা সঙ্গে সঙ্গে অবগত করে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেটাকে নতুন একটা খবর ছাড়া খুব বেশি ভয়াবহ মনে করেনি। বিশ্বকে এ ব্যাপারে বা নতুন করোনা ভাইরাসের মহামারি সম্পর্কে প্রথম দু'মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেইভাবে সতর্ক করেনি। বড়-ছোট বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারসহ সংশ্লিষ্টরা ব্যাপারটাকে পাত্তা দেননি। ফল যা হবার হয়েছে। বিরাট বিরাট দেশ বলে যাদের লোকে সমীহ করত, তারাই এখন ভয়াবহভাবে করোনা ভাইরাসের শিকার। চীন হয়তো উহানেই করোনা ভাইরাসকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারত বাকি বিশ্বের সহযোগিতা পেলে। চীন সেরকম কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েই পুরো শহরটাকে কারাগার বানিয়ে এর প্রতিবিধান করার পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু বাইরে বসে আমাদের অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল সেটা নিষ্ঠুরতা। পুরো শহরের মানুষকে কঠিনভাবে এভাবে অবরুদ্ধ করে ফেলা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। মায়াকান্নাটা আমাদের বেশি, সেজন্য পুরো ঘটনা সম্পর্কে না-জেনেই মনে করেছিলাম চীন নিষ্ঠুর আচরণ করছে তার নাগরিকদের সঙ্গে। বলা হল, চীন সরকার কীরকম নিষ্ঠুর, চিকিৎসার নামে পুরো একটা শহরের মানুষকে বন্দি করে রেখেছে। চীনের স্বৈরাচারী শাসনের স্বরূপ নিয়ে সারাবিশ্বে তখন সমালোচনা আরম্ভ হল। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যত দেশের মানুষরা

তখন উহানে ছিল বা যারা পড়াশুনার জন্য গিয়েছিল, সকলের তাদের আহাজারি শোনা গেল, শহরটাকে বন্দি করে চীন সরকার তাদের জীবনটা অনিশ্চিত করে ফেলেছে। মৃত্যুপুরীর মধ্যে তাদের বন্দি করে রেখেছে। ব্যাপারটা নিশ্চয় তেমন ছিল না। কিন্তু প্রচারগুলো ছিল খুব নেতিবাচক।

বিভিন্ন ধরনের খবর আসছিল তখন চীনের উহান সম্পর্কে, যার মধ্যে সকলে কমিউনিজমের ভূত দেখতে পেয়েছিল। সরকার মানুষগুলোকে বন্দি করে রেখেছে, খাবার দিচ্ছে না ঠিকমতো। সপ্তাহে যে খাবার দেয়া হচ্ছে সেটা পরিমাণে অনেক কম। চীনের যেসব খাবার দেয়া হচ্ছে তা খাওয়া যায় না। খাদ্য কেনার জন্য আবার ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছে না। বিশ্বের জন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়াবহ কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সে-খবরটাকে কম গুরুত্ব দিয়ে, চীনের শাসকদের দমন-পীড়নের কথাগুলোই বেশি বলা হল। কখনো এ ইঙ্গিতটা দেয়া হল না যে, সকল নিষ্ঠুরতার পরেও উহানেই যদি এ ভাইরাসকে নির্মূল করা সম্ভব হয় সারা বিশ্বই তাতে লাভবান হতে পারে। কিন্তু সকল রাষ্ট্র চাইলে করোনা সঙ্কটের সমাধান তখনি হতে পারত। যদি উহান থেকে এ ভাইরাসের উৎপত্তি হয়ে থাকে, সেটা উহানের মধ্যে আটকে রেখে নির্মূল করার পদক্ষেপই ছিল সবচেয়ে সঠিক। পাশাপাশি ইতিমধ্যে যেসকল নাগরিক উহান ভ্রমণ-শেষে বিভিন্ন দেশে ফিরে গেছে তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সকল সরকার তাদের নিজ নিজ দেশে কড়া নজরদারিতে রাখলে, তাদের সংক্রমিত হতে দেখলে তার প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সংক্রমণের সমাপ্তিটা সেখানেই ঘটতে পারত। কিন্তু কারো পক্ষেই তখন করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি, বিশ্বের জন্য তা কী পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। চীন যে মহামারির হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটাও বোঝা সম্ভব হয়নি। ফলে বিভিন্ন সমালোচনার মুখে চীন উহানে অবরুদ্ধ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সেসব দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। বাংলাদেশে ফিরে এল অনেকে। নিশ্চয় এখন তারা টের পাচ্ছে উহানে থাকা সঠিক ছিল, নাকি এই ফিরে আসাটা।

করোনা ভাইরাস নিয়ে চীন সম্পর্কে নানারকম মুখরোচক গল্প পরেও শোনা গেছে। কিন্তু বাস্তব সত্যটি হল, চীনই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রথম সঠিক পদক্ষেপটি নিয়েছিল। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রই এখন সবচেয়ে ভয়াবহ-রকম করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত, মৃতের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি সেখানে। কারণ রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প প্রথমে কিছুতেই চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কথা শুনতে চাননি।ট্রাম্পের জেদই যুক্তরাষ্ট্রকে ভয়াবহ বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রেই শুধু করোনায় আক্রান্তদের সংখ্যা সারা পৃথিবীর আক্রান্তদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের বেশি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মানুষের মৃতের ক্ষেত্রেও তাই। বর্তমানে এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে, করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার কথা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা জানতেন। কিন্তু খবরটা তাঁরা গোপন করেছিলেন। নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সহ বড় বড় ব্যবসায়ীরা তা চেপে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁদের ভয় ছিল, খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে ধস নামবে।ট্রাম্পের নিজেরই বিরাট ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য রয়েছে। ফলে শেয়ারবাজারে নিজেদের শেয়ারের দাম ঠিক থাকতে থাকতে সেগুলোর একটা বিলিব্যবস্থা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে নীরব রইল। বরং ট্রাম্প বলে বেড়ালেন, এটা একটা সাধারণ ফ্লু। কিছুদিন আবার চীনকে দোষারোপ করলেন। কিন্তু এখন বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ করছে, ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিতে দেরি করাতে যুক্তরাষ্ট্রে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং ইতিমধ্যেই এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ মারা যায়। ধনীক দেশগুলোর কাছে আসলে আগে নিজেদের মুনাফা, তার জনগণের জীবনের মূল্য। নিজেদের মুনাফার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুপথে পাঠাতে তাদের মনে সামান্য দ্বিধা নেই। যুক্তরাষ্ট্র তা স্পষ্টভাবেই তা প্রমাণ করেছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ঠিক একইভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় যথাসময়ে সতর্ক হতে পারেনি। বাংলাদেশ বছরের শুরু থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন বছরব্যাপী পালনের কাজে ব্যস্ত ছিল। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যে সময় হাতে পাওয়া গিয়েছিল ফলে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়নি। মনে করা হয়েছিল বাংলাদেশে সেরকমভাবে করোনা-র আক্রমণ হবে না। কয়েকজন মনীষী বলেছেন, করোনার সঙ্গে লড়তে করোনা-র আগে হাঁটতে হবে, পিছনে নয়। কিন্তু প্রায় সকলেই করোনার পিছনে হেঁটেছে। করোনা ভাইরাস আক্রমণের আগে সেভাবে সতর্কতা বা প্রস্তুতি নেয়নি। কিন্তু দরকার ছিল করোনা-র আক্রমণের আগে প্রস্তুত থাকা। করোনা-র আক্রমণ ভয়াবহ হতে পারে ধরে নিয়ে যারা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল, সেসব দেশ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে নিজের দেশের পরিস্থিতিকে। বাংলাদেশ যে প্রস্তুত ছিল না সেটা নির্দ্বিধায় যেমন সত্য, ঠিক তার চেয়ে বেশি সত্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি বলতে কী বোঝায়, সেটাই স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্টদের ধারণায় ছিল না। মন্ত্রী থেকে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীরা তবুও বলেছিলেন, যে তাঁদের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে এমনকি বড় বড় অনেক দেশের চেয়েও। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নানারকম ব্যর্থতার পরেও বলেছেন, জানুয়ারি মাস থেকেই নাকি তাঁরা যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর এমন বক্তব্যে বোঝা যায়, ক্ষমতায় বসে নিজেদের দোষ স্বীকার করতে শিখিনি আমরা, বিনয় শিখিনি, মহাবিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত সত্য বলতে শিখিনি। জীবনের সবটাই আমাদের লুকোচুরি। কিন্তু আমরা দেখেছি ডোবারস্ট্রাইন বলেছেন, ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি দরকার স্বচ্ছতা।

করোনা সংক্রমণের বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেখা যায়নি দায়িত্বশীল বেশিরভাগ মানুষকে। যাঁরা সমাজের অগ্রগামী ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন পেশার কর্ণধার ছিলেন সকলেই চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। যখন ইতালি, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র ভয়াবহ সংক্রমণের শিকার, যখন সৌদি আরব কাবাঘর বন্ধ করে দিয়েছে তখন সব দেখেও গা না-করাটা খুব লজ্জার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্ণধারেরা চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা এখন পদে পদে প্রমাণিত। সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরেও তাদের নির্বিকার থাকার পরিণতি রাষ্ট্র এখন টের পাচ্ছে। বিগত প্রায় তিন মাস পার হবার পর চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা বা লজ্জাজনক অব্যবস্থাপনার কারণে বহু রোগী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে পর্যন্ত। যারা হাসপাতালে আছেন তারা চিকিৎসা পাচ্ছেন না। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য বহু রোগী বিভিন্ন হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নিজে আশ্রয়ে ফিরে গেছে, বুঝতে পারেনি এখন আর কী করতে হবে। বহু জন হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে চিকিৎসার সামান্য সুযোগ না পেয়ে মারা গেছেন পথিমধ্যে। বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া কী দুর্ভাগ্যজনক তাদের জন্য! বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান মহাসচিব এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে প্রথম রোগটি ধরা পড়ে ৮ মার্চ। ঠিক এর তিন মাস আগে ধরা পড়ে চীনের উহানে। ইতিমধ্যে আরো তিন মাস পার হয়ে গেছে। ৮ মার্চের আগের তিন মাস আর পরের তিন মাসের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যবিভাগ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রথম তিন মাস আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগ তো পাত্তাই দেয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলল টেস্ট টেস্ট এবং টেস্ট। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান দুই হাজার কিট নিয়ে বলল, 'আমরা প্রস্তুত'।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেবার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতা দেখিয়েছেন আইইডিসিআর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তারা; করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মতো ভয়াবহ বিষয়টাতে যেন তাঁরা হেসে-খেলে আর বড় বড় কথা বলে সামাল দিতে চেয়েছেন। যা তাঁরা বড় মুখ করে বলেছিলেন, কিছুই কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে পারেননি। বরং নিজেদের পুরনো দোষ আর অযোগ্যতা চাপা দেয়ার জন্য, বর্তমানেও নানারকম সব কৌশল নিচ্ছেন যা দিনে দিনে বিপদ বাড়িয়েই তুলছে। নিজেদের সকল দোষ 'জনগণের অসচেতনতার নামে' ম্লান করে দিতে চাইছেন। সত্যি বলতে তাঁদের ভুলের মাশুল দিয়ে গিয়ে চিকিৎসকেরা অনেক বেশি সংখ্যায় করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বিএমএ-র মহাসচিব ইহতেশামুল এ সম্পর্কে সম্প্রতি যা বলেছেন তা দুঃখজনক। তিনি বলেন, সরকারের কার্যক্রমে শুরু থেকেই চিকিৎসকরা খুবই বিরক্ত ছিল। তাঁদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর নামে

রেইনকোট পরানো হয়েছে। সেটা পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘামে ভিজে চিকিৎসকেরা দায়িত্ব পালন করেছেন। নকল এন-৯৫ মাস্ক দেওয়া হয়েছে। থাকার জায়গা নিয়ে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব নিয়ে কথা বলায় কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একদিকে তাঁদের সম্মুখসারির যোদ্ধা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করা হয়েছে। এর ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় তিন হাজার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত এবং তাঁদের মধ্যে এক হাজার জনই চিকিৎসক।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণের প্রস্তুতি মানে শুধু চিকিৎসাসেবা দান নয়। ইতালি আর স্পেনের দিকে তাকিয়ে মাথায় রাখা দরকার ছিল, চিকিৎসকরা আর চিকিৎসাকর্মীরা সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে কী করতে হবে। মাথায় রাখা দরকার ছিল, যখন সংক্রমণের সংখ্যা বাড়বে, বহু চিকিৎসক আর হাসপাতালগুলো ভয় পেয়ে সাধারণ রোগীদেরকেও আর চিকিৎসা দিতে চাইবে না। সকলের মৃত্যুভয় আছে আর নিজ হাসপাতালে কেউ রোগ ছড়াতে চাইবে না। ফলে করোনা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি মানে সবকিছু মাথায় রেখে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতি। কিছুতেই যেন সারা দেশের চিকিৎসাসেবা বন্ধ না হয় তার প্রস্তুতি। কিন্তু সেরকম প্রস্তুতি মাথায় রাখা হয়নি, ফলে করোনায় আক্রান্ত না হয়েও বিভিন্ন রোগে বিনা চিকিৎসায় বহু মানুষ মারা পড়ছে। করোনা-র প্রস্তুতি মানে, করোনায় আক্রান্তদের জন্য হাসপাতাল সংখ্যা বাড়ানো, চীন রাতারাতি সে উদাহরণ রেখে গেছে। ফলে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সেবা দেয়ার জন্য হাসপাতাল বাড়ানো দরকার ছিল। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বিরাট আকার নিতে পারে সে বিবেচনা থেকেই হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো দরকার ছিল। পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের রোগনির্ণয় কেন্দ্র আর তার সুবিধা যথেষ্ট বাড়ানো আবশ্যক ছিল। সেসব কিছুই করা হয়নি, কিন্তু বলা হয়েছে সবরকম প্রস্তুতি আছে। চিৎকার করে এখনো যেন সে কথাটাই বলার চেষ্টা করছে চিকিৎসা-সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা।

রাষ্ট্রের প্রস্তুতি মানে শুধু রোগ নির্ণয় আর চিকিৎসা দানের প্রস্তুতি নয়। করোনা-র আক্রমণের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের ভিতরে আর যা যা ঘটতে পারে বা ঘটবে তার সবকিছুর জন্য প্রস্তুতি। বিশেষ কোনো মন্ত্রণালয় নয়, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার ছিল এর জন্য। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেন যে সুযোগ পায়নি, সে সুযোগগুলোও আমরা পেয়েছিলাম; কারণ এখানে আক্রমণ হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু সুযোগ পেয়েও সঙ্কট সমাধানে ন্যূনতম পরিকল্পনা নেয়া হয়নি, করোনা-র আক্রমণ হলে কীভাবে তা সামাল দেয়া হবে বা আক্রমণের আগেই কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যাবে। কিছু তাৎক্ষণিকভাবে বিশৃঙ্খল কার্যক্রম পালিত হয়েছে। চারদিক থেকে যখন লকডাউনের কথা বলা হচ্ছিল, সরকারের পরিকল্পনা কী জানা যায়নি। বিভিন্নরকম চাপের মুখে সরকার প্রথম ছুটি ঘোষণা করল মানুষদের ঘরে রাখবার জন্য। রাতারাতি মানুষকে ঘরে ঢুকতে বললেই যে তাঁরা ঘরে ঢুকে যাবে না, সেটাই তো বাস্তবসম্মত। বিশেষ করে বাংলাদেশ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয় যে, দুর্দিনে রাষ্ট্র তার খাওয়া-পরার সব দায়িত্ব নেবে আর মানুষ নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে বসে থাকবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র কি তার বিরাটসংখ্যক বেকার, অনিয়মিত উপার্জনকারী আর পুষ্টিহীন নাগরিকদেরকে চেনে না, তাদের বাস্তব অবস্থা জানে না? সমাজে যারা ধনী চাইলেই তারা তিন-চার মাসের হাটবাজার করে ঘরে ঢুকে যেতে পারে? সকল মানুষের কি সেই সুবিধা আছে? বাংলাদেশের সকল মানুষের কি ঘর আছে? যাদের সামান্য থাকার ব্যবস্থা আছে, তাদের ঘরের পরিবেশ কী? বাংলাদেশে কজন মানুষ নিজ ঘরে আলাদাভাবে থাকার সুবিধা ভোগ করে? কতজন রাস্তায় আর স্টেশনে ঘুমায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস, রাষ্ট্র কি তা জানে না?

সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর যদি পূর্ব থেকেই গোছানো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকত বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো পরেও যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতেন, তা হলে দেশের সকল হোটেলগুলো সাময়িকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে পারতেন। করোনায় বিভিন্নভাবে আক্রান্তদের সেখানে আইসোলেশনে রাখা যেত যাতে করে তারা আর রোগ না-ছড়ায়। বিশেষ করে প্রথমদিকে বিদেশ থেকে আগতদের ক্ষেত্রে এরকম করাটা খুবই বাস্তবসম্মত একটা কাজ হত। পরবর্তীতে আক্রান্ত অন্যদের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা

যেত। চিকিৎসকেরা কর্তব্যপালন শেষে দরকারে পরিবারের কাছে না-গিয়ে হোটেলগুলোতে থাকতে পারতেন, যাতে তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে না-পড়ে। কর্মরত আরো অনেকের ক্ষেত্রে এটা করা দরকার ছিল। বড় বড় হোটেল, মধ্যম মানের হোটেল, সাধারণ হোটেল সকল হোটেলগুলোকে এ এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেত। বহু তরুণ চিকিৎসকদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, বহু চিকিৎসকের বৃদ্ধ বাবা-মা আছেন, যদি চিকিৎসকদের পছন্দ থাকত তাহলে তাঁরা বাসায় না-গিয়ে হোটেলে থেকে যেতে পারতেন। নিশ্চয় তাঁরা সেক্ষেত্রে অনেক বেশি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন। বাংলাদেশের বহু মানুষের বাড়িতে রুম-সংখ্যা কম, অনেক মানুষ দুটো বা একটা কক্ষে ভাগাভাগি করে থাকে। যদি সেসব পরিবারের কেউ আক্রান্ত হলে তাদের হোটেলে এনে রাখা যেত, নিশ্চয় রোগ কম ছড়াত। সবচেয়ে বেশি যা দরকার ছিল, সামান্য সন্দেহে যে-কারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ থাকা– যা একেবারেই ছিল না। ফলে দু'মাসের ছুটি খুব বেশি সুফল দিতে পারেনি। কীভাবে সুফল লাভ করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর কোনো ভূমিকা বা আন্তরিকতা ছিল না। সঠিক কোনো পরিকল্পনাই তারা নিতে পারেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে আমলারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। চিকিৎসকেরা ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ তুললে তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, অন্যায়ভাবে তাঁদের শাস্তি দিয়ে নিজেদের জুলুম প্রতিষ্ঠা করেছে। মনে হয়েছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা যেন আমলা দ্বারা পরিচালিত, জনগণের সেবক কখনো মনে হয়নি।

বাংলাদেশের জন্য লক-ডাউন না করার সিদ্ধান্ত হতে পারত সবচেয়ে সঠিক যদি প্রথম থেকে অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকে সংশ্লিষ্টদের সঠিকভাবে নজর থাকত। বাংলাদেশের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল, যদি পূর্ব থেকেই সব পরিকল্পনা নেয়া হত। কারণ বাংলাদেশ হাতে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। বাইরে থেকে আগত সাত লক্ষ মানুষকে লক-ডাউন করে রাখলে, সতেরো কোটি মানুষকে লক-ডাউন বা গৃহবন্দি না-করলেই চলত। পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ নিয়ে বাইরে থেকে আসা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কয়েকটি শহরের মধ্যে বিশদিনের জন্য আটকে দেয়া যেত। সরকারের দু'মাসের ছুটি ঘোষণা মানুষকে গৃহবন্দি করার ফলে ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে কম খরচে এটা করা যেত। কিন্তু সেরকম পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো। কার ক্ষতি হল এখন, অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ফল পুরো জাতিকে ভোগ করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম এবং চাষাবাদ। গ্রামগুলোতে যাতে করোনা-র আক্রমণ ছড়িয়ে না-পড়ে, চাষাবাদ বাধাগ্রস্ত না-হয় তা নিয়ে কি কোনো ধরনের পরিকল্পনা ছিল? সবার আগে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে হয়। গ্রামগুলোতে সন্দেহজনক সংক্রমিতদেরকে প্রবেশ করতে না-দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল কি? ভিয়েতনাম সেটা করেছে। হয়তো আরো দেশ করেছে, যাদের খবর জানি না। নিশ্চয় বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন সিদ্ধান্তটা নেয়ার মতো সময় আমাদের হাতে ছিল।

লক-ডাউন দরকার ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের জরুরি বিভাগ আর চাষাবাদ এবং অর্থনীতির প্রধান দিকগুলো সচল রেখে, সকল দিক সামাল দিয়ে যথাযথ সুফল পেতে পরিকল্পিতভাবে লক-ডাউন আরম্ভ করা যেতে পারত। কিন্তু বাংলাদেশ লক-ডাউন ঘোষণা না-করে ছুটি ঘোষণা করেছিল। সরকারের এই ছুটি ঘোষণার ব্যাপারটা মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করেছে। ব্যাপারটা কি লক-ডাউন নাকি লক-ডাউন নয়, সে নিয়ে সব মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার কখনো লক-ডাউন না-বলে বার বার ছুটি বাড়িয়ে ব্যাপারটা দু'মাসের বেশি সময় ধরে চালিয়ে গেছে। কিছু মানুষ এই সময়টাকে লক-ডাউন ভেবেছে, কিছু মানুষ বুঝতেই পারেনি কী ঘটছে। কয়েক দফায় দু'মাস ছুটি দিয়ে সরকার কী ফলাফল অর্জন করতে চেয়েছে, সুনির্দিষ্ট করে এখনো কেউ বলতে পারবে না। চীন একটা শহরকে লক-ডাউন করে বাকি শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রেখেছিল। করোনা ভাইরাসে প্রথম আক্রান্ত দেশ চীন প্রথমেই বুঝেছিল, সারা চীনকে লক-ডাউন করতে হলে সারা দেশের অর্থনীতি আর উন্নয়ন ধসে যাবে। করোনা-র হাত থেকে তাতে মুক্তি আসলেও মানুষ মারা যাবে না-খেয়ে, জীবনধারণের বস্তুগত সুবিধা হারিয়ে। সারা দেশ জুড়ে দেখা যাবে বিশৃঙ্খলা আর হতাশা। সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিল সেটা। ফলে একটা শহরের মধ্যে করোনাকে প্রবলভাবে আটকে রেখে ছাড়া দেশকে বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল তারা। চীন সেটা করেই খুব স্বল্প সময়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছে।

বাংলাদেশের সরকারি লোকেরা অনেকে পরিশ্রম করেছেন, অনেকে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছেন কিন্তু সঙ্কটটা ছিল সঠিক পরিকল্পনার। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না-থাকায় সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের সদস্যরা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছেন। ভিন্ন দিকে সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে যেমন রাখা যায়নি, এমনকি তার যথাযথ হিসাবটা পর্যন্ত রাখা সম্ভব হয়নি। নিশ্চয় এই ব্যর্থতাগুলো সকলের নয়, সর্বোচ্চ মহলের। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি কোনো ছেলেখেলা নয়। প্রথম মাথায় রাখা দরকার ছিল, লক-ডাউন করা হবে কি হবে না। যদি তা করা হয় তবে কারা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি থাকবেন আর কারা নয়। খুব সহজ কথা, সকলে গৃহবন্দি হলে তো রাষ্ট্র অচল হয়ে যাবে। সবকিছুর শুরু থেকেই এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা, হিসাব আর পরিসংখ্যান করা দরকার ছিল। চাষাবাদের মানুষজনকে কি সত্যিই গৃহবন্দি করে রাখা যাবে? রাখা গেলে কতদিন? দোকানদারদের কি গৃহবন্দি করে রাখা যাবে? বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদকদের কি গৃহবন্দি থাকতে বলা যাবে? যাঁদের গৃহবন্দি করা যাবে না, রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অচল না-করে যাঁদের মাধ্যমে রাষ্ট্র সচল রাখতে হবে তাঁদের ব্যাপারে কী উদ্যোগ নেওয়া হবে? ভিন্ন দিকে যাঁরা গৃহবন্দি হবেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা দিনে আনে দিনে খান বা যাঁরা মাসের সামান্য বেতনে চলেন, তাঁদের কী হবে; কী পদ্ধতিতে তাঁরা গৃহবন্দি থাকবেন, তাঁদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা কী হবে; রাষ্ট্র কি তা ভেবে রেখেছিল? বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কোনো জেলায় বা দু-একটা অঞ্চলে বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যেখানে মানুষের কাছে ত্রাণসামগ্রী ঠিকমতো পৌঁছায় না, সারা দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষকে সেখানে যদি ত্রাণ দিতেই হয়, ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাবার উপায় কী হবে? নিশ্চিতভাবে তা জনগণের হাতে যাবে কিনা সে নিয়ে কি উৎকণ্ঠা ছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্ণধার আর উপদেষ্টাদের? সাধারণ মানুষকে এত কিছু না-বুঝলেও চলে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের, রাষ্ট্রের উপদেষ্টাদের এসব বুঝতে হয়।

বাংলাদেশ তখনো সংক্রমিত হয়নি, ফেব্রুয়ারি মাসে। ফলে মানুষের তখন আতঙ্কিত হবার কিছুই ছিল না। যদি তখন মানুষকে বলা যেত যে, "সামনে একটা ভয়াবহ বিপদ আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আমরা সতর্ক হই তাহলেই রক্ষা পাব। দু-একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ধরা পড়লেই আমাদের অনেককে গৃহবন্দি হতে হবে। সেটা হলে বিপদ আর বেশি বাড়বে না। যদি গৃহবন্দি হতে হয়, যাদের খাবারদাবার থাকবে না, সরকার তাদের খাবার পৌঁছে দেবে।" সরকারের তাহলে প্রস্তুতি থাকত, মানুষও প্রস্তুতি নিয়ে রাখত। মানুষ আগে থেকেই একটা পরিকল্পনা নিতে পারত, সেরকম পরিস্থিতি হলে কী করবে। যারা গ্রামে যেত, রাতারাতি হৈ-হুল্লোড় করে যেতে হত না। সংক্রমণ ছড়াতে পারত না। গ্রামে গেলে সংক্রমণের আগেভাগেই চলে যেত। যদি বহু আগে থেকে সে পরিকল্পনা থাকত, তাহলে বিদেশ থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁদের ব্যাপারেও কীভাবে কী করা হবে সে পরিকল্পনাটাও থাকত। কিন্তু কারো কোনো পরিকল্পনা ছিল না। যখন করোনা ভাইরাসের আক্রমণে চীনের পর ইতালি, স্পেন দিশেহারা হয়েছিল, বাংলাদেশের সকল টেলিভিশনগুলোকে কাজে লাগানো যেত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মানুষকে সচেতন করলে মানুষ সচেতন হবে না, সেটা কি বিশ্বাস করতে হবে? কিন্তু সেটা আমরা করেছি কি না? না করেই জোর দিয়ে বলছি কী করে যে, 'মানুষ সচেতন নয়'? যাঁরা দেশের কর্ণধার, তাঁরাই তো বিশ্বাস করেননি করোনা-র ভয়াবহ রূপটা কী হতে পারে। ফলে জনগণকে বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টাও ছিল না।

বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমগুলোর ব্যর্থতা খুবই দুঃখজনক। সাধারণ মানুষের কাছে করোনা কী কখনোই তারা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। মানুষ কেন হাত ধোবে, কেন ঘরে থাকবে কীভাবে করোনার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে, এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জনগণকে সচেতন করতে পারেনি গণমাধ্যমগুলো। গণমাধ্যম যা কিছু করছে ভদ্রলোকদের জন্য, সুবিধাভোগীদের কথা চিন্তা করে। কিন্তু সেটাও সফলভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে এ যাবৎ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে যত আলোচনা সব সুবিধাভোগীদের জন্য। সবাই বলছে করোনা-র হাত থেকে বাঁচতে হলে পুষ্টিকর আমিষ জাতীয় খাবার খেতে হবে, বেশি বেশি টাটকা ফল আর সবজি খেতে হবে, দুধ খেতে হবে। বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক মানুষের এসব খাবার সামর্থ্য

কি আছে? ফলে তাদের ওইসব পরামর্শ কাদের জন্য, দেশের কত শতাংশ মানুষের জন্য? টাটকা ফল আর পুষ্টিকর আমিষ কজন খাবার ক্ষমতা রাখে? বরং বলা যায়, দরিদ্র মানুষের এখন দুবেলা সঠিকভাবে ডাল-ভাত জোটে না। করোনা ভাইরাসটি আসলে কী, কীভাবে রোগ ছড়ায় আর মানুষ কীভাবে কী করলে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে; প্রান্তিক মানুষের বোধগম্য ভাষায় তা প্রচার করা দরকার ছিল। কিন্তু করোনা আক্রমণের আড়াই মাস পরেও সাধারণ মানুষ দূরের কথা, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও জানেন না, করোনা কীভাবে কোন্ কোন্ কানাগলি দিয়ে সংক্রমণের শিকার হতে পারে। ফলে তাঁদের অনেকেই ঘরে বসে থেকেও করোনা বাধিয়ে বসেছেন। এতদিন পরা বলা হচ্ছে, ঘরের রেফ্রিজারেটর থেকেও নানাভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে বা করোনা রোগ ছড়াতে পারে। এসব কথা তো প্রথমেই বলে মানুষকে সতর্ক করা যেত।

বাংলাদেশের প্রচারমাধ্যমে ইতিমধ্যেই নানারকম সময়ে বলা হয়েছে, করোনা-র ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কোনো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো তার স্বঘোষিত ওষুধ আবিষ্কারকে খুব উত্তেজনার সঙ্গে ফলাও করে প্রচার করেছে। সত্যিই সেসব আবিষ্কার কতটা বিজ্ঞানসম্মত বা গবেষণা দ্বারা গ্রহণযোগ্য সে বিচার-বিশ্লেষণে না-গিয়ে ব্যাপকভাবে তা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, বহু ওষুধ যা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরীক্ষিত নয় বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির স্বার্থে সেগুলোর পক্ষে প্রচার চালানো হয়েছে গণমাধ্যমে। কারণ সে ওষুধগুলো সংবাদমাধ্যমগুলোর মালিকদের প্রতিষ্ঠানের। সারা পৃথিবী যখন বলছে করোনা-র চিকিৎসার জন্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই, তখন বাংলাদেশ কী করে ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে বা ওষুধ আছে সে-কথা বলছে? জাপান থেকে আবিষ্কৃত যে ওষুধকে জাপান নিজে করোনা-র ওষুধ বলছে না, বাংলাদেশের ওষুধনির্মাতা প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে কীভাবে করোনার ওষুধ হিসেবে প্রচার চালাচ্ছে? মালিকদের মুনাফার স্বার্থে গণমাধ্যমগুলো জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এসব কাজ করেছে। বাংলাদেশের সুবিধাভোগী একটি গোষ্ঠী এখনো করোনা-র ভয়াবহতাকে আমলে নিচ্ছে না, নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য আর মুনাফা বাড়াবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেদের ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধাকে বড় করে দেখছে। যখন ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, করোনা-র ওষুধ আছে আর তাতে মানুষ সুস্থ হয়ে যাবে, তখন খুব স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কী করে করোনা-র ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করবে? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ওষুধগুলোর পক্ষে প্রচার চালিয়ে গণমাধ্যমগুলো এর দ্বারা নিজেদের চরিত্র স্পষ্ট করে তুলেছে। নিশ্চয় গণমাধ্যমগুলোর অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। গণমাধ্যমগুলোর শুধু খারাপ দিক আছে আর ভালো দিক নেই, ব্যাপারটা এমন তো নয়। কিন্তু তাদের ক্ষতিকারক ভূমিকাগুলো আলোচনায় আসা দরকার।

বহু জন মনে করছেন, সাধারণ মানুষেরা লক-ডাউন পালন করছে না বলে সংক্রমণ বাড়ছে। সাধারণ মানুষ কেন লক-ডাউন পালন করতে পারছে না, সে বিবেচনায় তারা যাচ্ছেন না। শিক্ষিত বা সুবিধাভোগী এসব মানুষের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ধারণা খুবই সেকেলে আর নেতিবাচক। সকল মানুষকে মর্যাদা দেবার সংস্কৃতি তাদের মানসিকতায় এখনো গড়ে ওঠেনি। ভদ্রলোকেরা নিজেরা অনেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন, নিশ্চয় সেটা সংক্রমণ কম ছড়াতে সাহায্য করেছে। ভদ্রলোকেরা নিজেদের স্বার্থে সেটা করলেও, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি অনেক সুবিধাভোগী সুযোগসন্ধানীরা ঠিক বিপরীত আচরণ করেছেন। বিভিন্নভাবে দেখা গেছে, বহু জন প্রশাসন চালাবার নামে দলবল নিয়ে আসর জমাচ্ছেন নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বহুজন ত্রাণ বিতরণের নামে বহু মানুষের ভিড় জমিয়ে তুলেছেন সেটার প্রচার বাড়াবার জন্য। নিশ্চয় তা সংক্রমণ বাড়তে সাহায্য করেছে। এঁরা তো লেখাপড়া-জানা, তথাকথিত শিক্ষিত ক্ষমতাবান মানুষ। নিশ্চয় এক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের মালিকদের উদাহরণটা টানতেই হয়। মালিক পক্ষ একদিকে বলেছে, তাদের সকল অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে ফলে শ্রমিকদের বেতন দেয়া সম্ভব নয়। ভিন্ন দিকে আবার শ্রমিকদের কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করেছে। যদি বিদেশের সকল অর্ডার বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে শ্রমিকদের কাজ করতে হবে কেন? প্রধানমন্ত্রী নিজে গত এপ্রিলের এগারো পর্যন্ত ছুটি ঘোষণার পর যা তাঁরা কী করেছেন? লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কাজে যোগদান করার আদেশ দিয়ে বিপদে ফেলেছেন। সত্যিই কি তারপর বলতে হবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার দায় শ্রমিকদের বা সাধারণ মানুষদের? দায়-দায়িত্ব পুরোটাই সুবিধাভোগী ভদ্রলোকদের। সরকারের কি এসব ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট নীতিমালা ছিল? সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে রহস্যজনক ছিল।

বাংলাদেশের সেই দুর্দিনে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াবার সেই প্রথম দিনগুলোতে অনেকের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করেছি, সবচেয়ে প্রয়োজন বেশিরভাগ মানুষের গৃহবন্দি থাকা। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করতাম, সরকারের দিক থেকে এর জন্য অত্যাবশ্যকভাবে পালনীয় কিছু শর্ত রয়েছে। সে-সকল শর্ত পালিত না-হলে মানুষকে গৃহবন্দি করা যাবে না। প্রধান শর্তটি ছিল, গৃহবন্দি থাকাকালীন অবস্থায় নিম্ন আয়ের মানুষদের ঘরে ঘরে খাবার সরবরাহ করা। সরকারি কর্মকর্তাদের একজনকে দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনলাইন আলোচনায় তখন প্রস্তাব করেছেন, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আরো বিনোদন দিতে হবে, যাতে মানুষ ঘরে আটকে থাকে। তিনি বিনোদন বলতে যে কী বোঝেন সেটা একটা দুর্বোধ্য বিষয় হয়ে রইল। টেলিভিশনে বিনোদন দেয়ার আগে গৃহবন্দি অসহায় মানুষকে খাবার পৌঁছে দেয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেটা আসলে করা হয়নি। নিজে আমি যেসকল দরিদ্র গৃহবন্দি মানুষকে চিনি তারা কেউই সরকারি সাহায্য পায়নি। বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের কর্মীরা, বা বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাদের খাদ্য জোগান দিয়েছিল এবং দিয়ে যাচ্ছে। যেসকল দরিদ্র কর্মজীবী মানুষ এ মুহূর্তে গৃহে বন্দি আছেন বা ছিলেন তাদের থাকা-খাওয়া নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার কিছু লোককে কিছু সাহায্য দিয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেটাকে সাহায্য দেয়া হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ সাহায্য পেতে হবে রাষ্ট্রের প্রতিটি দরিদ্র নাগরিককে। সরকারের স্মরণ রাখা দরকার ছিল, সার্বিক অর্থনীতির বড় সৈনিক দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষরা। চিকিৎসকদের দায়িত্ব তখন অনেক কমে যাবে, কর্মজীবী মানুষের দায়িত্ব বাড়বে। ফলে তাঁরা যেন সুস্থ থাকেন, সুগঠিত থাকেন সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারেনি। বাংলাদেশের সরকারগুলো অবশ্য কখনো নিজেদের এসব ব্যর্থতা স্বীকার করতে রাজি নন। বরং সরকারের লোকেরা এ ধরনের সমালোচনা পছন্দ করেন না। সবসময় নিজেদের সব কাজের প্রশংসা শুনতে চান।

চিকিৎসকরা লড়ছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধে। সামান্য কিছু দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে চিকিৎসকেরা সাহসী ভূমিকা রাখছেন। নিশ্চয় কিছু চিকিৎসক আছেন যাঁরা দায়দায়িত্বহীন, ক্ষমতালোভী, সুবিধাবাদী এবং ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির। তাঁদেরকে এ আলোচনায় রাখছি না। কারণ তার বাইরেও বিরাট চিকিৎসক সমাজ আছেন যাঁরা কম-বেশি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বহু চিকিৎসক আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। বিশেষ করে তরুণ চিকিৎসকেরা অনেকেই সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু সেই চিকিৎসকদের যথাযথভাবে কাজ করবার সুযোগ কম। হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা সামগ্রী যেমন অপ্রতুল, ঠিক তেমনি চিকিৎসকেরা এখন পর্যন্ত সঠিক সুরক্ষা পাচ্ছেন না। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত একটা ল্যাজে-গোবরে অবস্থা চলছে। নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় প্রতিদিন আতঙ্কের নানা কারণ বাড়ছে। বাংলাদেশের পাশের দেশ ভারত, যেখানে মোট জনসংখ্যা এক শত সাঁইত্রিশ কোটি সেখানে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশোর কিছু বেশি। বাংলাদেশে জনসংখ্যা যেখানে ষোল কোটি মানে ভারতের আটভাগের এক ভাগ, সেখানে বাংলাদেশে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। কেন এমনটা ঘটল? চিকিৎসকদের সুরক্ষার প্রতি ন্যূনতম দৃষ্টি দেননি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বরং ঘরে বসে নিজেদের সুরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদক মাহফুজ আনাম তাঁর এক লেখাতে অনেক আগেই বলেন, করোনা ভাইরাসের চেয়ে বড় বিপদ আমাদের মহারথীদের অযোগ্যতা যা বহুদিন ধরে বিপজ্জনক হয়ে আছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চমৎকার দিকনির্দেশনা দিলেও, এই অযোগ্য মানুষদের জন্য তা কিছুতেই আগাচ্ছে না। বিভিন্ন কর্তাব্যক্তির, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্বহীনতায় বহু অঘটন ঘটে যাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে বসে আছে। সত্যিকার অর্থে এসবের জন্য কে দায়ী তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। সেরকম অনুসন্ধানের সুযোগ এই মুহূর্তে কম। কিন্তু যিনি যে আসনে বসে রয়েছেন, কর্তব্য অবহেলার দায় তাঁকে নিতেই হবে। যদি দায় শুধু এর-ওর ঘাড়ে চাপানো হয় তাহলে কাজই এগোবে না। যিনি দায় নেবেন না, তিনি কর্তাব্যক্তি সেজে চেয়ারে বসে থাকবেন কেন, দায়িত্বশীল পদ ছেড়ে দেবেন।

যা আজকের নানা সঙ্কট তা ঘটেছে পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা না-নেয়ার কারণে। একই সঙ্গে তা ঘটছে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা আর দায়িত্বহীনতার কারণে। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়। প্রস্তুতি না-থাকার কারণে বহু ধরনের অঘটন ঘটেছে ছুটির একবারে শুরুর দিকে। মানুষ প্রতিদিন টন কে টন দুধ ফেলে দিয়েছে। দুধ কেনার গ্রাহক নেই, মিষ্টির দোকান সব বন্ধ। রাজধানীতে যে দুধ পাঠানো হত সেটা আর পাঠানোর সুযোগ ছিল না। প্রচুর খাবার কেনার লোক নেই, মাছ-মাংসে পচন ধরেছিল, তা ফেলে দিতে হয়েছে। যদিও পরে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকে যদি একটা পরিকল্পনা থাকত, তাহলে এরকম ঘটত না। বাংলাদেশে যেখানে খাবারের অভাব, মানুষের পুষ্টির অভাব; সেখানে আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়া থাকলে এসব খাবারের সরবরাহ চালু রাখা যেত ভিন্নভাবে। পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে বিভিন্ন খাবারের অনেকটা স্থানীয়ভাবে দরিদ্র মানুষকে দেয়া যেত। খাবার নেই কিন্তু টন কে টন খাবার ফেলে দিতে হয়েছিল। যারা এসব খাবারের ক্ষুদ্র উৎপাদক তারা কপর্দকহীন হয়ে পড়তে পারত। পূর্বে প্রস্তুতি থাকলে এমনটা ঘটত না। কী কী বন্ধ করতে হবে, আর কী কী বন্ধ করলে বিপদ হবে আগে থেকে জানা থাকলে এমনটা হত না। সরকার এসব ক্ষেত্রে পরে যথেষ্ট ভালো ভূমিকা নিতে পেরেছে। খাদ্য-সরবরাহ সচল রেখে খাদ্যসংকট তৈরি হতে দেয়নি। সরকারকে তার জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। যাদের ক্রয়ক্ষমতা ছিল তারা হাতের কাছে কিনবার মতো খাদ্য পেয়েছে। খাদ্য-সরবরাহ বা যোগানের ব্যাপারে সরকারে উদ্যোগ যথেষ্ট সফল ছিল। সরকার এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক সংকট অনেকটাই আপাতত কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

সরকারের ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে। বহু ব্যাপারে সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বিমুখী বা পরস্পর-বিপরীত নীতি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। বহু ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। ফলে একটি মন্ত্রণালয় এক ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছে ভিন্ন মন্ত্রণালয় ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। সর্বশেষ উদাহরণটাই দেয়া যাক। সরকার অফিস-আদালত খুলে দিয়েছে আবার অন্যদিকে বলা হয়েছে গণ-পরিবহন চলবে না। পরে আবার বলা হয়েছে, গণ-পরিবহন চলবে। এরকম পরস্পরবিরোধী বহু সিদ্ধান্ত সরকার বার বার নিয়েছে। যা জনগণকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা ভয়াবহ হয়রানির শিকার হয়েছে। করোনা-র এই দুঃসময়ে সঠিকভাবে বিবেচনা করে পরিকল্পনা নিলেও বহুকিছু যেমন এড়ানো যেত না ঠিক, বহু সঙ্কটই আবার এড়ানো যেত। করোনা ভাইরাসের ব্যাপারটা ভূমিকম্পের মতো ছিল না যে, প্রস্তুতি নেয়া বা সঙ্কটকে মোকাবেলা করার সুযোগ ছিল না। যদি পূর্বপ্রস্তুতি থাকত বহুকিছুই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত। পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে জনগণকে সচেতন করা যেত। ডা. ইকবাল আরসালান বলেছেন, যা আমরা শুরু করেছি সেটা অনেক দেরিতে শুরু করেছি। যদি ঠিক সময়ে শুরু করা যেত, তা হলে বহুকিছুর সমাধান সম্ভব ছিল। তিনি মনে করেন, সমন্বয়হীনতা ছিল আর-একটি সঙ্কট। প্রথম থেকে বলা হয়েছিল, সব ঠিক আছে, সবকিছু হয়ে যাবে। তিনি মনে করেন, এইরকম কথা বলে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব ছিল না। তিনি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। তিনি পরেও বার বার বলেছেন, বহু দেরিতে সব কিছু আরম্ভ করা হয়েছে এবং করোনা-র বর্তমান ভয়াবহতার মধ্যেও দায়িত্বশীলরা জাতীয় কমিটির দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজগুলো ঠিকমতো করছেন না। কার্যত মনে হচ্ছে, সঙ্কট সমাধানে এখনো তারা আন্তরিক নন। বরং কর্তব্যক্তিরা এখনো নিজেদের আর্থিক সুবিধা নিতেই ব্যস্ত।

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি এবং করোনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক চিকিৎসক ইকবাল আর্সলান গত মে মাসের মাঝামাঝি পুনরায় বলেছেন, ‘‘ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। করোনা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়ার অনেক সময় পেয়েও আমরা কাজে লাগাইনি। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেইনি।’’ তিনি বলেন, আসলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমরা যুদ্ধে নেমেছি। যাদের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা তারা গণমাধ্যমে বার বার বলেছেন, ‘‘করোনা-র বিরুদ্ধে লড়তে শতভাগ প্রস্তুতি আছে। যুদ্ধে নামার পর দেখা দেখা গেল কোনো প্রস্তুতি নেই। ঢাল-তলোয়ার কিছু নেই।’’ তিনি করোনা সংক্রান্ত বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সমালোচনা করে বলেন, ‘‘কোভিড সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না-থাকা, বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত না-নেওয়া ও সময় পেয়েও প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে নামায় আজ এই বিপর্যয়। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।’’ সরকারের যদি করোনা মোকাবেলায় এবং জনগণের জীবনপ্রাণ রক্ষায় সঠিক পরিকল্পনা এবং আন্তরিকতা থাকত তা হলে খুব

সুচিন্তিত কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেত। সবকিছু নিরীক্ষণ করার পর কিছু কিছু বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অঞ্চলকে আগে থেকেই মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা দরকার ছিল। করোনা দ্বারা সংক্রমিত নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত না-হয়ে সেখানে কেউই প্রবেশাধিকার করতে পারবে না। তাহলে সেইসব ব্যাপক অঞ্চলে চাষাবাদ আর সবকিছু স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হত। কিন্তু এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সামান্য পরামর্শ নেয়া হচ্ছে না। সকল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমলারা।

গত ১৫ জুন ডা. ইকবাল আর্সলান বলেন, ''জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক এবং এ নিয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শ না-নিয়ে শুধুমাত্র আমলারা তাদের নিজ দায়িত্বে এবং নিজ কর্তৃত্বে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'' তিনি আরো বলেন যে, আমলারা এখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তারা একাধারে জনস্বাস্থ্য ও করোনা বিশেষজ্ঞ এবং প-িত। তারাই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন বিশেষজ্ঞ বা জনস্বাস্থ্য কর্মীদের কোনো গুরুত্ব নেই। করোনা চলাকালে সম্প্রতি যে জাতীয় বাজেট ঘোষিত হয়েছে তা প্রমাণ করে রাষ্ট্রটি ধনীদের সুবিধা দেয়ার জন্য যত উদগ্রীব, জনগণের চিকিৎসা প্রদানে তার সামান্যমাত্র নয়। করোনা আক্রমণকে কাজে লাগিয়ে যেন ধনীরা তাদের মুনাফা লাভের সিঁড়িটাকে আরো উঁচু করে তুলতে চাইছে। রাষ্ট্র এখনো জনগণের অভিযোগ নিয়ে ভাবছে না। করোনা সংক্রমণে বিশেষজ্ঞদের দেয়া পরামর্শ পর্যন্ত কানে নিচ্ছে না।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ মহামারির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক তালিকার শীর্ষ আঠারো নম্বরে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সংক্রমণের হার বিভিন্ন বিপর্যস্ত দেশের চেয়ে বেশি। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর দায়দায়িত্বহীনতা আর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার অভাব থেকে সেটা বেশি ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার, বর্তমানে সরকারের ঘোষিত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যার চেয়ে প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। গত মে মাসের মাঝামাঝি আইইডিসিআর-এর একজন উপদেষ্টা ডা. মুশতাক বলেছেন, ''করোনা রোগীর সংখ্যা আসলে শনাক্তের চেয়ে বিশ থেকে চল্লিশ গুণ বেশি হতে পারে''। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. বিজন কুমার শীল কিছুদিন আগে বলেছেন বাংলাদেশের ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আবার সুস্থ হয়ে গেছেন কিন্তু বহু জনই তা টের পাননি। বিএমএ-র মহাসচিব সম্প্রতি একই কথা বলেছেন। তিনি, এ প্রসঙ্গে বলেন, এখনো স্বাস্থ্য বিভাগের প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে বাস্তবতার অনেক গরমিল রয়েছে। যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়েছে, তখন বাস্তবের সঙ্গে সরকারের তথ্যের গরমিল থাকবেই। ডা. মুশতাক এবং ডা. বিজন কুমার করোনায় আক্রান্তের যে সংখ্যাটা বলেছেন গবেষণা করে কথাটা বলেননি, ফলে তাদের সংখ্যাটা নিয়ে গুরুত্ব না-দিয়ে কথার ভাবটাকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। সরকার সংখ্যাটা ঘোষণা করেছে তার করোনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মানুষের যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি তখন মূল সংখ্যাটা যে সরকারের ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কারণ নেই। কারণ বেশির ভাগ মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা গেলে যে সংখ্যাটা বহু গুণ ছাড়িয়ে যেত সেটা বিশ্বাস করার যুক্তি আছে বর্তমানে সীমিত আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিসংখ্যান দেখে। সরকার আদৌ এসব ব্যাপারে স্বচ্ছ নয়।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক আবদুল্লাহ গত মে মাসের শেষে বলেছেন, ''সারাদেশেই করোনা এখন আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন ঢাকার বাইরে করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি অত্যন্ত আতঙ্কের এবং এর ফলে মহাবিপদ সৃষ্টি হতে পারে।'' তিনি এ কথাও বলেন, ''নাগরিক হিসেবে আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। নাহলে আমরা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হব।'' তিনি যথার্থ বলেছেন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ বলেন, ''ঢাকার বাইরে চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক দুর্বল। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ঢাকার বাইরে করোনা চিকিৎসা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ সেখানে অক্সিজেনের স্বল্পতা রয়েছে। আইসিইউ নেই। এমনকি উপজেলা পর্যায়েও আমাদের জটিল করোনা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে।'' তিনি বলেন, ''ইতিমধ্যে সরকারি হাসপাতালগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যে বেসরকারি হাসপাতাল সরকার নিয়েছিল, সেখানেও এখন জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। যদি

রোগী এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে, যা আমাদের জন্য আরেকটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" চিকিৎসক আবদুল্লাহ বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। চিকিৎসক আবদুল্লাহ যা বলেছেন যা প্রকট উদাহরণ হল, চিকিৎসকেরাই আর নিজ হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না। কিন্তু গত তিন মাসে সরকার চাইলে করোনা-র চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো যেত।

করোনা-র আক্রমণের এই ভয়াবহতার মধ্যে যদি এখন সামনের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। না হলে মহামারির পাশাপাশি দেখা দেবে খাদ্যসংকট বা দুর্ভিক্ষ। কৃষি বা চাষাবাদের ব্যাপারটাতে তাই এখন বিশেষ জোর দিতে হবে। গ্রামের লোকসংখ্যা কম, সেখানে দূরত্ব বাঁচিয়ে কাজ করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের প্রচার দ্বারা গ্রামের মানুষদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করোনা-র সংক্রমণ থেকে তারা নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে। ফলে কৃষিকর্মে যুক্ত মানুষদের নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে যেতে হবে। চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা করোনা ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। ফলে গ্রামগুলোকে যতটা সম্ভব এই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। করোনা-র আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর যদি সকল রকম বিপর্যয় থেকে প্রাথমিকভাবে বাঁচতে চাই, কৃষিই আমাদের বাঁচাবে। মনে রাখতে হবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন কিছু ছিল না, প্রথমে সুরক্ষা দিয়েছিল কৃষি-অর্থনীতি। যুদ্ধের সময় কৃষিকাজ বন্ধ ছিল না। সারা পৃথিবীর অর্থনীতির মূল হচ্ছে কৃষি বা খাদ্য। মানবসভ্যতার প্রথম অর্থনীতি কৃষি বা চাষাবাদ। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করার পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে যা করতে হবে, চাষাবাদ চালু রাখা আর খাদ্যসংকট থেকে রক্ষা পাওয়া। চাষাবাদের ব্যাপারে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের পরামর্শ নেয়া খুব দরকার।

হাঁস-মুরগি গবাদিপশু পালন বা চাষ যেন বন্ধ না-হয়ে যায় তার জন্য সকল অপ্রয়োজনীয় খাত বাদ দিয়ে সেখানে টাকা ঢালতে হবে। সকলকে উৎসাহ জোগাতে হবে নিজের বাড়ির সঙ্গে চাষযোগ্য জমিতে কিছু একটা চাষ করার জন্য। কৃষির বাইরেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উৎপাদন চালু রাখতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। যারা এই উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাদেরকে সচেতন করতে হবে নিজেদের সুরক্ষা সম্পর্কে। যতটা সম্ভব বয়স্কদের বাদ দিয়ে কমবয়স্কদের এসব কর্মে যুক্ত রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ সচল রাখতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের কথা আলাদাভাবে ভাবতে হবে। পুলিশ সহ সবকিছু সচল রাখতে যাঁরা যুক্ত সকলে যেন সংক্রমণের শিকার না-হন, যেন সুরক্ষা পান সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিছু মানুষজন যতদিন গৃহবন্দি থাকছে ততদিন কর্মে নিযুক্ত অন্যদের সুরক্ষা লাভের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। মানুষকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হবে। গণমাধ্যমগুলোর কাজ হবে নিয়মিত সাধারণ মানুষকে বোধগম্য ভাষায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বলা, সুরক্ষিত থাকার পথ দেখানো। সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞানের কথা সহজভাবে বললে গ্রহণ করবে না, হতেই পারে না। কারণ তাদের জীবনসংগ্রাম বিজ্ঞানসম্মতভাবেই পরিচালিত হয়ে থাকে। না হলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তারা ফসল ফলাতে পারতেন না। ঋতুর নিয়ম মেনে তারা চাষ-আবাদ করেন, পুরোহিতের কথা শুনে নয়। বিজ্ঞানের কথা সকলের আগে তারা গ্রহণ করবে যদি তাদেরকে সঠিকভাবে বোঝানো যায়।

করোনা রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন যে খবরগুলো আসছে তা মেনে নেয়া কষ্টকর। বিভিন্ন হাসপাতালে ভিআইপি রোগীরা বিশেষ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন সরকারের হস্তক্ষেপে। সাধারণ বহু রোগী সেসব সুবিধা পাচ্ছেন না। বিনা চিকিৎসায় তাঁদের মৃত্যুর দিন গুণতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিরন্ময় দত্ত লিখেছেন, হাসপাতালের যে জায়গাটা বিশেষভাবে পঁচিশ জন রোগীর জন্য নির্ধারিত সেখানে আঠারো-বিশটা শয্যায় অক্সিজেন পোর্ট আছে আর একটা পোর্ট একজন রোগীর চাহিদা যোগান দিতে পারে। কিন্তু সেখানে শয্যা আর মেঝে মিলিয়ে পঁচিশ জনের জায়গায় রোগী আছে নব্বই জনের বেশি

যাদের প্রায় সকলের অক্সিজেন দরকার। ফলে দেখা যাচ্ছে একটা পোর্ট থেকে ভাগাভাগি করে চার-পাঁচ জন অক্সিজেন নিচ্ছেন। করোনা রোগীরা নিজেদের মধ্যে সামান্য গ্যাপ না-রেখে হাসপাতালে অবস্থান করছেন। চিকিৎসক যে রোগী দেখার জন্য হাঁটবেন সে জায়গাটা পর্যন্ত নেই। সেখানে আবার আছেন রোগীর দেখাশুনা করার আত্মীয়স্বজনরা। কিছু তরুণ চিকিৎসক তাঁর মধ্যে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে চলেছেন দেবদূতের মতো। ডা. হিরন্ময় দত্তের কথাগুলো বুঝিয়ে দেয় তরুণ চিকিৎসকেরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দেয় সামনের দিনগুলো আরো কতটা ভয়ঙ্কর। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে, ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সঠিকভাবে চিকিৎসা না-পেয়ে মারা গেছেন। অধ্যাপক কিবরিয়া অসুস্থ অবস্থায় নিজের জন্য অক্সিজেন চেয়ে পাননি, বলা যায় চিকিৎসা-সুবিধা লাভ না করেই মারা যান। বহু উদাহরণ বাড়ানো যাবে। প্রতিদিন খবর আসছে, রোগীদের নিয়ে আত্মীয়স্বজনেরা হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে কিন্তু ভর্তি করাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত রোগী তাদের চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে। কীরকম একটা রাষ্ট্র আমরা পেয়েছি তা এখন বুঝতে আর অসুবিধা হয় না।

করোনা রোগীরা চিকিৎসা পায় না, রোগীদের অক্সিজেন জোটে না– মহামারির ক্ষেত্রে অনেক সময় এমনটা মেনে নেয়া যায়। ঘটনা এমনটা হতেই পারে যখন হঠাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে দেশে সরকারি আমলা মন্ত্রীরা কোটি টাকা দামের গাড়ি চড়েন সে দেশে এসব মানা যায় না। কারণ কোটি টাকা দিয়ে হাসপাতালের জন্য বহু অক্সিজেন সামগ্রী কেনা সম্ভব। বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের কথা বাদ দিলে, সরকারি লোকজনেরা যেভাবে বিলাসিতা করার সুযোগ পান, সেটা আর এখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সামান্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে যেখানে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় খুবই কম, সেখানে সরকারি আমলা-মন্ত্রী-সাংসদদের বিলাসিতা করা, দামি গাড়ি চড়ে বেড়ানোটা আর যুক্তিসঙ্গত হয় না। রাষ্ট্র আসলে এইসব সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে আদৌ ভাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ বহুকিছুকে স্পষ্ট করে তুলছে, বাংলাদেশে আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার চেহারাটা কী দেখা যাচ্ছে। সারা দেশে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ন্যূনতম পঁচিশ জন চিকিৎসক মারা গেছেন। খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, তাঁরা অনেকেই সঠিক চিকিৎসাটা পাননি। স্বাস্থ্যখাতের নানারকম অনিয়ম আর দুর্নীতির খবর আসছে প্রতিদিন। সেই দুর্নীতি এতটাই ভয়াবহ যে, ডা. আবদুল্লাহ সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে, দুর্নীতি বন্ধ না-করে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু সে টাকাটাও চলে যায় জনগণের চিকিৎসায় ব্যয় না হয়ে চলে যায় দুর্নীতিবাজদের পকেটে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। বাজেটে ব্যয় বাড়ালে তা দুর্নীতিবাজদের পকেটে চলে যাবার সম্ভাবনা। সে রকম একটি দেশের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেয়াটাই তো লক্ষ্যহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তাই মন্ত্রণলয়ের ওপর নিশ্চিত ভরসা করে বসে না-থেকে সকল স্তরের বিশেষজ্ঞ এবং সৎ পেশাজীবীদের যুক্ত করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ওপর থাকবে তাদের সকলের নজরদারি। প্রতিদিনের টাকা খরচের হিসাবটা চলে যাবে অনলাইনে, যাতে পুরো দেশবাসী চাইলে তা নজরদারি করতে পারে। বাড়তি টাকাও দিতে হবে এর জন্য। তার পর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে এগোতে হবে এবং খুব দ্রুত। চিকিৎসক আবদুল্লাহ যে কথাগুলো বলেছেন, তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যখন রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বিপুলভাবে বাড়ছে তখন বিভিন্ন মধ্যম মানের বড়সড় হোটেল আর বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠানকে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। হাসপাতালগুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ দরকার নেই। দরকার খুব সাধারণ হাসপাতাল যেখানে সূর্যের আলো ঢুকবে এবং বাতাস চলাচল করবে। সেখানে চিকিৎসার সামগ্রী ঠিকঠাক থাকতে হবে। দরকার হলে দ্রুত সকল প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য সমন্বিতভাবে বসে দাম এবং মান যাচাই করে নির্দেশ পাঠাতে হবে বিভিন্ন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে। হাসপাতালের ভবনগুলো কতটা আধুনিক তা এখন আর জরুরি নয়। দরকার পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শৌচাগার, পয়ঃনিষ্কাশনের সকল সুবিধা থাকা। কিছু কিছু সুবিধাজনক হোটেলকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। খুব বিলাসবহুল কক্ষ তার জন্য দরকার নেই, দরকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। কিউবার হাসপাতালগুলো খুব বিলাসবহুল নয়, সাধারণ মানের। কিন্তু সেখানে প্রতি একশো ত্রিশজনের জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন। বিলাসিতা দেখানোটা সেখানে প্রধান নয়, প্রধান

লক্ষ্যটা হল জনগণকে চিকিৎসা প্রদান। লক্ষ্য বাদ দিয়ে উপ-লক্ষ্য নিয়ে হৈ-চৈ করার কিছু নেই। প্রধান বিষয় ভবনটা কত সুন্দর তা নয়, চিকিৎসকরা রোগীর প্রতি কতটা দায়িত্বশীল আর চিকিৎসকরা কতটা মেধাবী আর দক্ষ। যদি সামনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা স্বস্তি লাভ করতে হয় সরকারকে অস্থায়ীভাবে করোনা সংক্রান্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কিছু উদ্যোগ দ্রুততার সঙ্গে নিতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে কিছু চিকিৎসক আর চিকিৎসাসেবীকে করোনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখানে নিয়োগ দিতে হবে।

সংকট এড়াবার পথ যখন নেই, খুব ঠা-া মাথায় বিবেচকের মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সকল বিপদে উদ্ধারের একটা-না-একটা পথ থাকবেই। পথটা খুঁজতে হবে, সেজন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সকল পেশার মানুষের সমন্বিতভাবে এবং পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়া। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যার বিরুদ্ধে লড়াই সে আমাদের কোনো সচেতন শত্রু নয়। নিজে কিছু না-বুঝেই আমাদের আক্রমণ করে বসছে। কথাটা তো ঠিক আমাদের নিজেদের অসতর্কতার জন্য সে বিরাট হয়ে উঠেছে। যদি পাশ্চাত্য আগে সচেতন হত, তা হলে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এইরকম দেশগুলো বিপদে পড়ত না। যদি তারা বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার না-হত আমরা অনেক বেশি নিরাপদ থাকতে পারতাম। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা ফেরানো যাবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। প্রধান কাজটাই হচ্ছে, রাষ্ট্রের সকল সামর্থ্য, সকল সম্পদ এই লড়াইয়ে নিয়োজিত করা। সকল মানুষকে বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। গণমাধ্যমগুলো এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে এসময়ে। গণমাধ্যম এ সময়ে মানুষকে সাহস জোগাতে বিরাট শক্তি। সরকারকে সারা দেশজুড়ে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালাতে হবে সংক্রমিতদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য। বাংলাদেশে ন্যূনতম প্রতিদিন এক লক্ষ লোকের পরীক্ষা হওয়া দরকার। সম্ভব হলে আরো বেশি। সরকারের সকল সম্পদ এখন করোনা প্রতিরোধে ব্যয় করতে হবে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যর্থতা:

বলতে আর দ্বিধা নেই, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা অকার্যকর। প্রথম থেকেই, প্রতিষ্ঠানটি "ধরি মাছ না-ছুঁই পানি" এরকম একটা জায়গায় অবস্থান করছে। নিজের সুবিধা বা স্বার্থে সেটা করে করুক। কিন্তু হু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবার জায়গা থেকে মানুষের সামনে সে কোনো যথাযথ পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা রাখতে পারেনি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে তার অবস্থান কখনোই মানুষের মনে আশা জাগায়নি, ঠিক তেমনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোনো সামগ্রিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাঙা রেকর্ড বাজানোর মতো করে বার বার যা বলছে, তা হল লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন আর সাবান-পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হাঁচি হলে রুমাল দিয়ে বা হাতের কনুই দিয়ে নাক ঢাকা। বিশ সেকেন্ডই সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে কেন, কেন বিশ সেকেন্ডের কম নয়, বিশ সেকেন্ড হাত ধুলে কী হবে; সাধারণ মানুষের কাছে সেটাও তারা স্পষ্ট করতে পারেনি। স্পষ্ট করার চেষ্টাও করেনি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের সঙ্গে বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়ার সম্পর্কটা কোথায়, কেন বিশ সেকেন্ড সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়াটা জরুরি বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ তা জানে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটা জানানোর জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের কথা বাদ দিলাম, বিশ সেকেন্ডের অধিক সময় সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুলে করোনা ভাইরাস কীভাবে অকার্যকর হয়, সেটা যথেষ্ট সনদধারী শিক্ষিত বহু মানুষ পর্যন্ত জানেন না। সমাজের অগ্রগণ্য বহু জনের সঙ্গে কথা বলে এ ধারণা আমার হয়েছে। না-জানাটা তাদের দোষ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেমন ব্যাপারটা পরিষ্কার করেনি সাধারণের কাছে, স্থানীয় গণমাধ্যম বা চিকিৎসরা পর্যন্ত সেটা স্পষ্ট করে বলছেন না।

নিশ্চয় বিশ সেকেন্ড সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া খুবই কার্যকর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ জানে না সেটা কেন বা কীভাবে কার্যকর। ফলে যারা অন্ধ অনুকরণে হাত ধুচ্ছে, আমি আমার চারদিকের মানুষের ক্ষেত্রে দেখেছি খুব ভুলভাবে সেটা পালিত হচ্ছে। বাজার থেকে ফিরে কেন হাত ধোবে, কেন গোসল করবে বা কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে সেটাও তাদের কাছে

পরিষ্কার নয়। ফলে সব কিছু তারা করছে কিন্তু কোনোটাই সঠিকভাবে নয়। ধর্ম পালন করার মতো অন্ধভাবে নির্দেশ পালন করে চলেছে। কিন্তু দরকার ছিল চিত্রের সাহায্যে বার বার সবাইকে দেখানো যে, সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুলে করোনা ভাইরাসটি কী সঙ্কটে পতিত হয়। সাবান-পানি আর করোনা ভাইরাসের সম্পর্ক কী আর কীভাবে সেটা করোনা ভাইরাসকে অকার্যকর বা ধ্বংস করে দেয়। সত্যিকারভাবে করোনা ভাইরাসের পরিচয়টি তুলে ধরে কীভাবে সাবান-পানি তার ধ্বংস ঘটায় যদি জনগণকে বোঝানো যেতো, তা হলে সংক্রমণ কিছুতেই এতটা ছড়াত না। মাস্ক ব্যবহার আর দূরত্ব বজায়-এর মাধ্যমে করোনা-র সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা আর সাবান-পানির সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়াটি যদি সকল মানুষকে সহজভাবে উপলব্ধি করানো যেত, করোনা-র আক্রমণ বিশ্বজুড়ে এভাবে বিস্তার লাভ করত না। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সরকার আর হাসপাতালগুলোকে এটাও বোঝানো দরকার ছিল, করোনা-র একমাত্র প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে দরকারমতো সংক্রমিতদের অক্সিজেন সরবরাহ। করোনা আক্রান্ত রোগীরা অন্যরা সকলে সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাবে, যাদের ফুসফুস আক্রান্ত হবে তাদের জন্য দরকার পড়বে অক্সিজেন, অক্সিজেন আর অক্সিজেন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে টিকা নেই, পরীক্ষিত কোনো ওষুধ নেই; সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ভয়াবহভাবে আক্রান্তের জন্য মূল চিকিৎসা যে অক্সিজেন সেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কেউই বুঝাতে চেষ্টা করেনি। বিরাট একটা সঙ্কট তৈরি হয়েছে এই সত্যটা জোরালোভাবে লাগাতার প্রচার না-করাটা। করোনায় আক্রান্ত বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ যথাসময়ে বা যথাযথ অক্সিজেন না-পাওয়াটা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সমাজের ক্ষমতাবানদের জায়গা। সেখানে যারা কাজ করেন তারা নিজেদেরকে ভাবেন সমাজের অগ্রণী, মনে করেন তাদের মতো মহান ক্ষমতাধর জ্ঞানী মানুষদের নির্দেশে বিশ্ব চললে জনগণের উপকার হবে। ফলে নির্দেশ দিয়েই তারা খালাস, তারা মনে করেন সঠিক নির্দেশ দিয়ে বিশ্বের বিরাট উপকার করে ফেলেছেন। কিন্তু সবটা না-বুঝে সে নির্দেশ মানুষ কেন অন্ধের মতো পালন করবে, সে বিবেচনায় তারা যান না। তাদের শিক্ষার অহঙ্কার বা তাদের প্রাপ্ত শিক্ষা তাদেরকে এটাই শিখিয়েছে, তাদের অনুসরণ করলেই দেশ ও জাতির মঙ্গল। যদি উদ্দেশ্য সৎ বা মহৎ হয় তবুও অন্ধ অনুকরণে সঠিক ফল পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনেকগুলো সঠিক পরামর্শ দিতেই পারেনি। তার মধ্যে হাসপাতালে যেন কিছুতেই অক্সিজেনের ঘাটতি না-দেখা দেয় তার জন্য সতর্ক রাখা, দরকার হলে অস্থায়ীভাবে হাসপাতাল বাড়ানো যাতে সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে গেলে রোগীদের চিকিৎসা পেতে অসুবিধা না-হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ ব্যাপারে নির্দেশনা নেই। যদি খুব প্রয়োজনীয় এটুকু নির্দেশনা দিতে না-পারে তাহলে সে কীসের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথমে বলেছে, যারা করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত নয়, তাদের মাস্ক পরার দরকার নেই। সেই কথা শুনে অন্ধভাবে বাংলাদেশের আইইডিসিআর বলে দিল যারা করোনা রোগী নয় তাদের মাস্ক পরার দরকার নেই। সাধারণের মাস্ক পরা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পর্যন্ত ছাড়ল না সেখানকার কর্মকর্তারা। কিন্তু এখন কী দেখা গেল, সকলকে মাস্ক পরতে হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বড় দায়িত্বটি ছিল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। কিন্তু তা তারা করেনি, তারা কিছুটা সতর্ক করেছে মাত্র। সতর্ক করেছে এমনভাবে যে ভদ্রলোকদের কাছে সেটা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের ভদ্রলোকেরা এখন লক-ডাউন আর কোয়ারেন্টাইন ছাড়া আর কিছু বুঝতে রাজি নয়।

সত্যি বলতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই নিজেদের ভোগবিলাস আর সুযোগসুবিধা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। ফলে জনগণের সেবায় এসব প্রতিষ্ঠান খুব কার্যকর হয় না; কিছু গৎ-বাঁধা গবেষণা, কিছু গৎ-বাঁধা কার্যক্রম পালন করে চলে। তাতেই তারা তৃপ্ত থাকে। বেতন নেবার জন্য কাজ করে, মানুষের মঙ্গলের জন্য নয়। আমার এক বন্ধু কিছুদিনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় গবেষণা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন কাজ করেননি। তাঁর বন্ধুটি তখন হু'র বড় পদ দখল করে আছেন। কিন্তু দিল্লিতে যখন কাজ করতে গেলেন, দিল্লির হু'র কর্তাব্যক্তিটি আমার বন্ধুটি সম্পর্কে জানতেন যে, তিনি সবসময় নিজের অর্থে জনগণের স্বার্থে বহু গবেষণা করে সুনাম আর সম্মান অর্জন করেছেন। দিল্লির কর্তাটি তাই শুরুতেই আমার বন্ধুকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন গবেষণা প্রস্তাবনার বাইরে গিয়ে বিপ্লবী কিছু করার চেষ্টা না-করেন। আমাদের এ বন্ধু প্রচুর প্রাপ্তিযোগ থাকা সত্ত্বেও সেখানে আর চুক্তি শেষ হবার পর থাকেননি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যদি এই হয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সে কি মানুষের

কল্যাণে কিছু করতে পারবে? বরং তার দ্বারা বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবা বিভ্রান্ত হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে এই সংস্থাটি এক-এক সময়ে এক-এক রকম অদ্ভুত সব কথা বলছে আবার তা ফিরিয়ে নিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির আসল কার্যক্রম কী তাতে ধারণা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান একটি দায়িত্ব ছিল করোনা ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে মানুষকে জানিয়ে দেয়া। ভাইরাসটি নিজে নিজে কোন পরিবেশে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে, মানুষের শরীরের বাইরের ত্বকে তা কতটা সময় বেঁচে থাকে, মানুষের পোশাকে এবং ঘরের আসবাবপত্রে কতটা সময় টিকে থাকে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষকে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়া হু'র দায়িত্ব ছিল; যাতে মানুষ সেই হিসেব থেকে কার্যকরভাবে ভাইরাসটির সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু হু এসব করেনি। কিছু মানুষ জনস হপকিন্স-এর গবেষণাপত্র, ইংল্যান্ড মেডিক্যাল জর্নাল ইত্যাদি থেকে এ সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছে। সেইসব গবেষণায় দেখা যায়, শীত বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ কক্ষ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য মোটেই ভালো কিছু নয়। জাপান-সহ কয়েকটি দেশের গবেষণাপত্র বলছে 'বদ্ধ ঘর' খুবই খারাপ, যেখানে আলো-বাতাস চলাচল রয়েছে সেরকম কক্ষ করোনা সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অধিক কার্যকর। সূর্যের আলো বিশেষ করে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি করোনা ভাইরাস ধ্বংসে বেশ উপযুক্ত। যদি আমরা লক্ষ করি দেখব, শীতপ্রধান দেশগুলোতে করোনা আক্রমণের প্রকোপ আর মৃতের হার অনেক বেশি। কারণ প্রচ- শীতে দরজা-জানালা খোলার সুযোগ নেই বলে মানুষকে সেখানে বদ্ধ ঘরে থাকতে হয়। দেখা গেছে যেখানে করোনা ভাইরাস অনেক বেশি সময় অনেক শক্তি নিয়ে টিকে থাকতে পারে। ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘরে, যেখানে আলো-বাতাস কম চলাচল করে সেরকম হাসপাতালগুলোতে করোনা ভাইরাস অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। সূর্যের তাপ যেখানে প্রবেশ করে এবং যেখানে আলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, সেরকম স্থান ভাইরাসকে যতটা দুর্বল করতে পারে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘর তা পারে না। কিন্তু এসকল ব্যাপারে হু কোনো দিকনির্দেশনা দেয়নি।

বহু জন বলবেন, যদি গ্রীষ্ম বা গরম আবহাওয়া করোনা ভাইরাসকে দুর্বল করতে পারে, তা হলে বাংলাদেশে এত মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে কেন কিংবা ভারতে? চিন্তা করতে হবে এ সঙ্কটের প্রকৃত কারণটি কী। দুর্ভাগ্য যে, হু আমাদের এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। যদি আমার মস্তিস্ক ব্যবহার করি তা হলে দেখব, গরম বা আলো-বাতাস কখনো আক্রান্ত রোগীর শরীরের ভিতরের ভাইরাসকে দুর্বল করতে পারে না। কারণ মানুষের শরীরের ভিতরে প্রাকৃতিক গরম বা আলো-বাতাস প্রবেশ করে না। ফলে মানুষের শরীরের ভিতরে ভাইরাসে তা কার্যকর নয়। সেটা দুর্বল করে মানুষের শরীরের বাইরের ভাইরাসকে। ফলে রাস্তাঘাটে, বাতাসে, বস্তুর উপর থাকা ভাইরাসকে দুর্বল করে গরম আবহাওয়া, আল্ট্রাভায়োলেট রে আর আলো-বাতাস। ফলে শীতপ্রধান দেশের রাস্তাঘাটে বা বাইরের বিভিন্ন বস্তুতে বা পণ্যদ্রব্যে ভাইরাসটি যতক্ষণ টিকে থাকবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে তা ঘটবে না।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে শীতপ্রধান আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খুব একটা ফারাক হবে না। ভাইরাসটি কীভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে? শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যম। ফলে যখন কেউ একজন আক্রান্ত রোগীর সামনে গিয়ে সরাসরি তার দ্বারা আক্রান্ত হবে, তার কাছ থেকে সরাসরি নিজের নাকের ভিতরে ভাইরাসটিকে গ্রহণ করবে, তখন গরম আবহাওয়া বা আলো-বাতাস আর সাহায্য করতে পারবে না। কারণ আলো-বাতাস বা গরম ভাইরাসটিকে দুর্বল করার আগেই তা সরাসরি একজনের শরীর থেকে আর-এক জনের শরীরে প্রবেশ করবে। কিন্তু ধরা যাক একটি পণ্য, যা বহুক্ষণ সূর্যের তাপের স্পর্শে এসেছে তার উপর থাকা ভাইরাসটি দুর্বল হবে। না-হলে সূর্যের তাপে কিছুক্ষণ রেখে কাপড়-চোপড়, পিপিই, বা মাস্ক জীবাণুমুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে কেন?

ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘরে রোগীর হাঁচি থেকে বের হয়ে আসা জীবাণু হাসপাতালের বিছানায়, বিছানার চাদর বা খাটে বা মেঝেতে কিংবা চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পিপিই বা পোশাকে যতক্ষণ টিকে থাকবে, আলো-বাতাস প্রবাহিত হয় এমন ঘরে ততক্ষণ থাকবে না। কী হচ্ছে তা হলে? বদ্ধ ঘরের বিছানার চাদর স্পর্শ করলে যতটা ভাইরাস ছড়াবে আলো-বাতাস আছে এমন ঘরে তার

চেয়ে কম ছড়াবে। হু এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেয়নি। কিন্তু অন্যান্য অনেক গবেষণার প্রেক্ষিতে এরকম ধারণা করার যুক্তি আছে। যদি সেটা না-হত, ভারত-বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে যেখানে মানুষ কিছু মানছে না, সেখানে রোগীর সংখ্যা আরো অনেকগুণ বেড়ে যেত। ধরা যাক, আমার নিবাস বহুতল ভবনের চারদিকের কিছু মানুষ যেমন দারোয়ান, পিয়ন, নিরাপত্তারক্ষী আর ছোট দোকানদারেরা যেভাবে সর্বক্ষণ মালিকপক্ষের জন্য এটা-ওটা কিনছে, যেভাবে দোকানদারেরা বহু মানুষের কাছে তা বিক্রি করছে; আমি দেখলাম এদের একজনও দু'মাসে আক্রান্ত হয়নি। বহাল তবিয়তে আছে, একজনেরও আক্রান্ত হওয়ার খবর পাইনি। খুব অবাক করার ব্যাপার নয় কি? কারণ তাদের বিক্রি করা বা ক্রয় করা পণ্যের ভাইরাসটি তত শক্তিশালী নয়, আলো-বাতাসে আর গরমে তা দুর্বল হয়ে গেছে। না-হলে প্রতিদিন এতরকম পণ্য স্পর্শ করার পর তারা আক্রান্ত হচ্ছে না কেন? ঊার বার যে তারা হাত ধুচ্ছে তা-ও কিন্তু নয়। ফলে গ্রীষ্ম বা সূর্যের তাপ আর আলো যে একটা সহযোগিতা করছে, তা মেনে নেবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোনো নির্দেশনা বা গবেষণাপত্র নেই।

ভিন্ন প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশের মানুষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত

বাংলাদেশের মানুষ করোনাকালে স্পষ্ট দুটো শিবিরে বা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। যার একদিকে আছে, লক-ডাউনের পক্ষের মানুষ যাদের খাওয়া-থাকার চিন্তা নাই। মাসের পর মাস তারা ঘরে বসে থেকে নিশ্চিন্তে আহার জোগাতে পারে। স্বচ্ছল এরকম মানুষের বিপরীতে আর এক পক্ষ আছে, যাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এত তীব্র যে করোনা ভাইরাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। লক-ডাউনে ঘরে বসে বসে নিশ্চিন্তে খাবার মুরোদ নেই তাদের। সমাজে তাদের এমন ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা নেই যে, ঘরে বসে থাকলে কেউ তাদের খাবার দিয়ে আসবে, নিয়মিত তাদের খোঁজখবর নেবে। সাদামাঠাভাবে করোনাকালের এই হল দুটো পক্ষ; যারা লক-ডাউনের জন্য হাহাকার করছে, অন্য পক্ষ করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত নয়; বরং আতঙ্কিত তাদের জীবীকা নিয়ে। কারণ নানা ভাবে অতিরিক্ত আয় করে তারা কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারেনি যে দু-এক সপ্তাহ ঘরে বসে নিশ্চিন্ত খেতে পারবে। ফলে লক-ডাউন যারা চায়, আর যারা চায় না, তারা যে আলাদা দুটি অর্থনৈতিক পরিম-লে বাস করে, এ নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নেই। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাই মূলগতভাবে তার জীবনযাপন আর সকল কার্যক্রম বা পন্থা নির্ধারণ করে দেয়। প্রশ্ন আসতে পারে, যে দুটি পক্ষের কথা বলা হল, এর বাইরে কি আর পক্ষ নেই? হ্যাঁ আছে। তবে সেটা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন পক্ষ যাদের চরিত্রটা বুঝে ওঠা কঠিন। সে তৃতীয় পক্ষ হল সরকার। করোনা ভাইরাসের মতোই তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা কঠিন। কারণ সরকার পক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই, "ধরি মাছ না-ছুঁই পানি" এমন জায়গায় অবস্থান করছে। নারী সম্পর্কে একটা প্রবাদ আছে, "নারীর মন দেব না জানন্তি"। নারী সম্পর্কে সেটা সত্য কি-না বিতর্কসাপেক্ষ। তবে সরকারের মন বোঝা বড়ই কঠিন।

করোনা ভাইরাসের এই মহামারিকালে বাংলাদেশের সরকার লক-ডাউন কথাটা কখনো বলেনি। প্রথম থেকেই ছুটি ঘোষণা করেছে। পুনরায় কয়েকবার ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। কথাটা খুব স্পষ্ট, ছুটি আর লক-ডাউন এক কথা নয়। ফলে মানুষজন ছুটিকালীন সময়ে অফিস আদালতে যাবে না এটা বোঝা যায়, কিন্তু মানুষজন আর কী করবে বা করবে না এ ছুটিকালীন সময়ে তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। ছুটি মানে তারা কর্মস্থল ছেড়ে গ্রামে বা অন্যত্র যেতে পারে ছুটি কাটাতে, বা না-ও যেতে পারে। সম্পূর্ণ এটা তাদের স্বাধীনতা, তাদের এখতিয়ার তারা কী করবে। সরকারের এ ব্যাপারে সামান্য নির্দেশনা নেই। ঢাকার বহু ভদ্রলোকেরা তখন তাদের গৃহকর্মীকে সাময়িক ছুটি দিয়েছে, কেউ কেউ সম্পূর্ণ বিদায় করে দিয়েছে। ফলে এদের হাতে কাজকর্ম নেই, ঢাকায় এদের থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই। ফলে নিজেদের বিবেচনামতো তারা নিজ নিজ গ্রামে চলে যাবার কথাই ভাবল। সকলে তারা গ্রামে যাত্রা করল। এটা ছিল সম্পূর্ণ তাদের নাগরিক অধিকার। কিন্তু পর দিন বহু প্রগতিশীল ভদ্রলোকদের বার্তায় এ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ হতে দেখা গেল। সকলে মনে করল এরা করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে। কিসের ভিত্তিতে ভদ্রলোকেরা নিশ্চিত হল যে, তারা সকলে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত? দ্বিতীয়ত যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেউ প্রমাণ করেনি তারা আক্রান্ত তখন ঢালাওভাবে এমন অভিযোগের ভিত্তি ছিল না। পরে তা প্রমাণিতও হয়নি। সর্বশেষ কথাটা হল, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষিত হলে গ্রামে যাবে না শহরে

থাকবে এ ব্যাপারে আদৌ কারো নাক গলাবার সামান্য অধিকার ছিল কি? সাধারণ মানুষ ভিড় ঠেলে যাবে, না আরাম করে যাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার অধিকার কি দিয়েছে কেউ কাউকে? সাধারণ মানুষ প্রতি ঈদে এরকমভাবে নিজ ঠিকানায় যাত্রা করে আসছে বছরের পর বছর ধরে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার। ভদ্রলোকদের বা কারো এ নিয়ে তাদের প্রতি সামান্য কটুক্তি করার অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রের বা দেশের ভালোর জন্যও নয়। যদি দরিদ্র সেসব মানুষরা দেশের মঙ্গলের জন্য ভদ্রলোকদেরকে কখনো জিগ্যেস করত, "কেন তোমার দেশের ক্ষতি করে বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাও, কেন তোমরা দেশের এত টাকা ব্যয় করে সন্তানদের বিদেশে পড়াও, কেন তোমরা বিলাসিতার পেছনে এত অর্থ ব্যয় করো, কেন তোমরা প্রয়োজনের চেয়ে এত অতিরিক্ত খেয়ে রোগ-শোক ডেকে আনো," ভদ্রলোকেরা কি সেটা পছন্দ করত নাকি সেটাকে পাত্তা দিত?

যারা কয়েক মাসের খাবারদাবার নিয়ে ঘর নিশ্চিন্তে বসে লক-ডাউন পালন করে সময় কাটাতে পারে তাদের সঙ্গে দারিদ্র্যেও সম্পর্ক নেই। ভালো রান্না করে খাওয়ার সুযোগ যেমন তাদের আছে, ঠিক নিয়মিত আবার ফেসবুকে খাবারের বা ছাদ-বাগানের ছবি দিতে পারে। সন্তানের বা পরিবারের জন্মদিন পালনে করোনা ভাইরাস সামান্য সঙ্কট সৃষ্টি করে না তাদের জন্য। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মরে যাওয়ার আতঙ্কটুকু ছাড়া জীবনযাত্রা তাদের যথেষ্ট স্বাভাবিক। লক-ডাউন তাদের কাছে এখন বিরাট চাহিদা, চাহিদাটা তৈরি হয়েছে তাদের নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার জন্য। লক-ডাউন রক্ষা করা হচ্ছে না বলে তারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। নিশ্চয় আমাদের মতো ভদ্রলোকদের দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে কায়িক শ্রম দিতে হয় না। চাল ডাল তরকারি মাছ মাংস কোথা থেকে উৎপাদিত হয় তা পর্যন্ত সকলের জানতে হয় না। যথেষ্ট টাকা আছে, দরকারমতো নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল ডাল মাছ মাংস তরকারি বা বিলাসদ্রব্য কিনতে পারে দাম যা-ই হোক। লক-ডাউন লক-ডাউন করে তাই তারা সবকিছু মাতিয়ে তুলছে। যারা লক-ডাউন মেনে চলছে না তাদের সম্পর্কে যখন যা-খুশি মন্তব্য করছে। যারা কাজের সন্ধানে বা খাবারের সন্ধানে লক-ডাউন মানছে না যদি পুলিশ বা প্রশাসন তাদের ঠেঙ্গিয়ে ঘরে বন্দি করে তাতে আমার মতো এসব সুধীজনদের সামান্য আপত্তি নেই। বরং পুলিশ তখন আমাদের বন্ধু বা আপনজন হয়ে দাঁড়ায়। লক-ডাউন-প্রীতি আমাদের এত বেশি যে, সামান্য এ কথাটা পর্যন্ত বিবেচনা করতে রাজি নই তখন যে, সাধারণ নাগরিকদের গায়ে হাত তুলবার সামান্য অধিকার নেই প্রশাসনের। সংবিধান তা অনুমোদন দেয় না। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মনে করছে, লক-ডাউন পালন করার জন্য পুলিশ পিটিয়ে নাকি ঠিক কাজটিই করছে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন এদের চিকিৎসা দিতে পারে না তখন ভদ্রলোকেরা কী ভূমিকা পালন করে?

সকলের নিজের মতো করে ভালো থাকা অধিকার আছে। ভদ্রলোকেরা নিজেরা সুস্থ থাকতে চায়, সেজন্য তারা নিজের ইচ্ছায় নিজের আরোপিত লক-ডাউন মেনে নিয়েছে, ইউরোপ-আমেরিকার অনুকরণ করে। নিশ্চয় সে অধিকার তাদের আছে। ফলে সরকার লক-ডাউন না বললেও তারা ছুটিটাকে লক-ডাউন হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। তাতে দোষের কিছু নেই, নিজের ভালো ভিন্ন কারো ক্ষতি না-করে তারা চাইতেই পারে। কিন্তু নিজের ভালোর জন্য আগ-বাড়িয়ে অন্যের ভালো চাইতে পারে না। নিজেদের ওপর আরোপিত লক-ডাউন অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইতে পারে না। কিন্তু আগেই বলেছি এসব ব্যাপারে সরকারের মন বোঝা দায়। আইইডিসিআর বলেছে, যারা করোনা-আক্রান্ত নয় তাদের মাস্ক পড়ার দরকার নেই। কিন্তু দেখা গেল মাস্ক না-পড়ার জন্য পুলিশ জনসাধারণকে পেটাচ্ছে। সরকার বলেছে, কাঁচাবাজার দোকানপাট খোলা থাকবে। কিন্তু মানুষ হাটবাজার করতে গিয়ে পুলিশের হয়রানির শিকার হচ্ছিল। লক-ডাউন সরকার যেহেতু ঘোষণা করেনি, তা হলে তখন নাগরিকদের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যেতে বাধা থাকার কথা নয়, কিন্তু পুলিশ বাধা দিয়েছে। সরকারের মন বোঝা এসব ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারের মন বুঝতে না-পারার আর উদাহরণ না-টানি। কারণ সকলের এসব অনেক কিছু জানা। সরকারের কাছে নিশ্চয় জবাব আছে এসব প্রশ্নের, জবাবদিহিতা কতটুকু আছে তা জানি না।

লক-ডাউন নিয়ে সরকারের মন বুঝতে না-পারার কারণেই আসলে ভদ্রলোকদের সঙ্গে অ-ভদ্রলোকদের ভুল-বুঝাবুঝিটা অনেক বেড়েছে। ভদ্রলোকেরা বলতে চাইছেন, সরকার কী করবে, মানুষ তো কথা শুনছে না। ভদ্রলোকদের কথায়, সরকার সঠিক জায়গায় আছে, হতচ্ছাড়া মানুষগুলো কথা না-শুনলে সরকার কী করবে। দিনের শেষে যত দোষ নন্দ ঘোষ। সব দোষ ছোটলোকের বাচ্চাদের। কিন্তু প্রশ্ন, সরকার আদৌ লক-ডাউন দিয়েছিল কি? ছুটির মধ্যে পোশাকশ্রমিকেরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল কেন? সত্যি বলবার সাহস আমাদের মতো ভদ্রলোকদের সবসময় থাকে না, সবসময় বহু দূর থেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলি। বলির পাঁঠা সেখানে সমাজের দুর্বলেরা। যাদের এখন ছোটলোক বলে নিন্দা করা হচ্ছে, কদিন পর তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়বে না। নিজেদের চেহারাটা ভালো করে আয়নায় দেখি না, তা হলে বোঝা যেত কতটা উচ্চস্তরে বাস করি আমরা!

সরকার এখন ছুটি তুলে দিয়েছে। সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত বা দ্বিমত পোষণ করতে পারি। কিন্তু নিন্দুকেরা বলছে, জুন মাস সামনে রেখে হঠাৎ এই ছুটি বাতিল এসব আমলাদের চক্রান্ত। বাজেটের আগে পুরনো সব পাওনা সব বুঝিয়ে দিতে না-পারলে, নিজেদের পাওনাটা পকেটে আসবে না। বাজেট ঘোষণার আগে জুন মাসে তড়িঘড়ি করে তাই ছুটি বাতিল করা হয়েছে। লক্ষ করলাম, নিজের ফেসবুক-বার্তায় একজন সরকারকে নির্বোধ বলেছে এ-জন্যে। কথাটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি নানা কারণে। সরকার নির্বোধ কিন্তু আর আমি বোধসম্পন্ন এটা একটা আত্মঅহমিকার প্রকাশ। যাই হোক, সরকার নির্বোধ এমন বাক্য ব্যবহার করার মতো অতটা নিশ্চিত বোধসম্পন্ন মানুষ আমি নই। নিজেকে আমি এতটা সঠিক মনে করি না। ভাষা ব্যবহারে কাউকে চট করে নির্বোধ বলাটাও আমি সঙ্গত মনে করি না। কারণ কে নির্বোধ আর কে বোধসম্পন্ন তার বিচার করবে কে? কিন্তু এটা বলতে পারি করোনা ভাইরাস আক্রমণ মোকাবেলায় সরকারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট দ্বিমত আছে, বিভিন্ন সমালোচনা আছে। সরকারের জাতীয় কমিটির সদস্যরা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আরো অনেক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের সমালোচনা করেছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা দানে সরকারের ব্যর্থতা সর্বত্র আলোচিত। ফলে সরকারের নানা সমালোচনা আছে আমার দিক থেকে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। শুধু করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বলছি কেন, বহু ক্ষেত্রেই সরকারের নীতির সঙ্গে দ্বিমত আছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে যেমন আছে, গত ঊনপঞ্চাশ বছরের প্রতিটি সরকারের সঙ্গে নাগরিক হিসেবে আমার চিন্তার নানা অমিল ছিল। তার মানে এই নয় যে সর্বদা আমি ঠিক ছিলাম। কিন্তু ভুল বা ঠিক হই, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার রাষ্ট্রে আমার থাকতে হবে, সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। রাষ্ট্রের সংবিধানই আমাকে সেই সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছে।

সরকার যে গত একত্রিশে মে থেকে ছুটি আর বাড়ায়নি বা তথাকথিত লক-ডাউন তুলে দিয়েছে তাতে বেশিরভাগ খেটে-খাওয়া মানুষের সমর্থন আছে। ঢাকায় বসে সেটা আমরা অনেকে বুঝতে পারছি না। কারণ খেটে-খাওয়া মানুষেরা ঘরে বসে না-খেয়ে মরার চেয়ে কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনলাভের নিশ্চয়তা চাইছে। যদি তারা স্বাভাবিক জীবন লাভ করার শর্তে করোনা-র আক্রমণে মরতে ভয় না-পায়, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার কিছু নেই। যদি কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে চায় কার কী বলার আছে! শ্রমিকেরা যখন নোংরা পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়, শ্রমিকেরা যখন কয়লার খনিতে বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করে, কিংবা যখন অনেক বাড়িতে গৃহকর্মীরা অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের জীবন-মরণ নিয়ে আমরা তো চিন্তিত থাকি না। আজ তবে আর চিন্তিত কেন? যদি তাদের জীবন বিনাশ হয়, হবে। না-খেয়ে রোগে-শোকে তারা তো মারা যাচ্ছেই, এ আর এমন কী! যখন আগে কখনো এসব নিয়ে ভাবিনি, আজ ভাবছি কেন? বরং যারা লক-ডাউনে না-থেকে স্বাভাবিক জীবন বজায় রাখতে চায় না, বিভিন্ন কারণে তাদেরকে ধন্যবাদ দেবার আছে। মনে রাখতে হবে, সকল সত্যের বিপরীত সত্য আছে। নিশ্চয়, যারা লক-ডাউন চেয়েছে তারা যে বিরাট ভুল করেছে তা তো নয়। কিছু মানুষ লক-ডাউনে থাকতে চেয়েছে বলে বা লক-ডাউনে তাদের থাকার সৌভাগ্য ছিল বলেই, পথে-ঘাটে ভিড় বা জনস্রোত কম ছিল। সেটা অন্যদের আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। সেটা আরো ভালোভাবে হতে পারত যদি সরকারের এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা থাকত। হয়তো তাহলে লক-ডাউন এতটা দীর্ঘ করতে হত না। কিন্তু আসলে না হয়েছে ঘর-কা, না হয়েছে ঘাট-কা।

যাঁরা গৃহবন্দি হতে চেয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে তাঁদের একটা ইতিবাচক পরিকল্পনা ছিল। মানুষ গৃহবন্দি থাকলে সংক্রমণ ছড়াতে সময় লাগে। সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সাধারণ মানুষেরা যখন লক-ডাউন চেয়েছে, সরকার তখন টানা দেড় মাস লক-ডাউন ঘোষণা করে, সেই অবসরে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারত। কারণ পুরো দেশকে সঠিকভাবে লক-ডাউন রাখা গেলে, সংক্রমণ খুব কমই ছড়াত। সরকার আন্তরিক হলে সেই সুযোগে হাসপাতালে যা যা চিকিৎসা সামগ্রী দরকার তা জোগাড় করতে পারত। নতুন কিছু হাসপাতাল তৈরি করা যেত সে অবসরে। চিকিৎসক আর স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে করোনা প্রতিরোধে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেত। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে ল্যাজে-গোবরে অবস্থাটা হয়েছে তা হত না। কিন্তু সরকারের আসলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল না। সকল সঙ্কটের কারণ সেখানেই। দুঃখজনক যে, সঙ্কটের আসল কারণ সন্ধান না-করে ভদ্রলোকেরা সকল দোষ চাপিয়েছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। সাধারণ মানুষ ঘরে থাকেনি কেন? কারণ রাষ্ট্রটা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়। বহুদিন ধরে সেখানে বিধিবিধানগুলো জনকল্যাণমূলক নয়। সরকার জনবিচ্ছিন্ন তো বটেই, ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। যারা কায়িক শ্রম দেয়, তাদেরকে মনে করে নির্বোধ ছোটলোক। কিন্তু ভুলে যাই, এই নির্বোধ লোকেরাই পুরো দেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। রাষ্ট্রের বিরাট সঙ্কটে তারা ভদ্রলোকদের সাহায্য ছাড়া সংগ্রাম করে টিকে থাকবে, ভদ্রলোকেরা তাদের সাহায্য ছাড়া তা পারবে না।

নিশ্চয় শ্রমজীবী মানুষের চিন্তাভাবনার নানা ত্রুটির দিক রয়েছে। কিন্তু সেসব নিয়ে কখনো কি ভদ্রলোকেরা ভেবেছেন? সাধারণ মানুষের ত্রুটিগুলো কী? কেন? আর তা কীভাবে সমাজের ক্ষতি করে? স্মরণ রাখতে হবে, শ্রমজীবী মানুষের সকল অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ধনিকরা, সুবিধাভোগীরা। হ্যাঁ, মার্কস, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাঁরা সকলে দেখিয়েছেন, পুষ্টির অভাব, মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার না-পাওয়া, কাজের একঘেয়েমি তাদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে ভোঁতা করে দেয়। ফলে জীবনের কঠিন লড়াইয়ের ব্যস্ততায় গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রতি তাদের দৃষ্টিকে আর সহজে প্রসারিত করতে পারে না। চিন্তা-ভাবনা হয়ে পড়ে গ-িবদ্ধ। ভয়-ভীতি তাদের সেভাবে তাড়িত করে না। তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় শুধু টিকে থাকবার লড়াই। সেজন্য তারা ভালো-মন্দ যে-কোনো পথ বেছে নিতে পারে। হতে পারে চরম নিষ্ঠুর। কারণ টিকে থাকাটা তখন আসল কথা। ফলে দেখা যায় এরা অনেকে হয়ে দাঁড়ায় গোপন জগতের সহযোগী যোদ্ধা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে সেই নিষ্ঠুর কঠিন পথ বেছে নেয়। স্বভাবতই, সে দোষটা তাদের নয়। রাষ্ট্র এবং সমাজ তাদেরকে সে পথে নিয়ে গেছে। সে অপরাধটা রাষ্ট্রের আর তার জন্য দায়ী ধনীদের শোষণ আর লোভ। সকল মানুষের শিক্ষালাভের চরম সার্থকতা হচ্ছে, শ্রমজীবী এই মানুষদেরকে সম্মান দেখাতে পারা, তাদের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য ভাবতে পারা। করোনা-কালে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে বেশি। লক-ডাউনটা এতদিন চলেছে আসলে ভদ্রলোকদের অনেকের সুবিধামতো। নিজেরা আমরা ঘরে নিরাপদে থেকেছি, অথচ বাড়ির চাকর-বাকর বা দারোয়ানকে হাজার কাজে বাইরে পাঠিয়েছি। তখন সামান্য চিন্তা করিনি যে, সে মানুষটা আক্রান্ত হতে পারে কি-না। তখন আমরা আমাদের অর্থেও দাপট দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থে লক-ডাউন ভঙ্গ করেছি। সত্যি কথাটা হল এই, আমরা ভদ্রলোকেরা যখন যে কথাটা বলি, শুনতে তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক, বলি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে। ভাব করি নিজেদের এক একটা মহাপ্রাণ হিসেবে। বিশেষ করে পোশাকশিল্পের মালিকেরা এ ব্যাপারে চরম নির্লজ্জতা প্রকাশ করেছে।

সর্বশেষ কথা

বাংলাদেশে যাঁরা এখনো লক-ডাউনে যারা থাকতে চান তাঁদের থাকতে কোনো বাধা নেই। কেউ তাঁদের না করবে না। যতদিন দরকার তাঁরা লক-ডাউনে থাকতে পারেন। কিন্তু এটাও সত্যি বাংলাদেশের অবস্থা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, মহামারি যে আকার ধারণ করেছে তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা জন্য হয়তো সরকারিভাবেই আবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লক-ডাউন দিতে হবে। কিন্তু সেই লক-ডাউন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখে দিতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বা উপজেলায় সে লক-ডাউন দরকার কিনা সেটা বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে। সকল মানুষকে দরকার না-হলে লক-ডাউনের মধ্যে বন্দি করে ফেলার দরকার নেই। সব দিক বিবেচনা করে, খুব চিন্তাভাবনা করে, হিসাব-নিকাশ করে লক-ডাউন ঘটাতে হবে যেন সেটা পরিপূর্ণতা পায়। স্বল্প আয়ের এবং দরিদ্র সকল মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে এই সময়কালে। সরকারকে সে সময়কালে ন্যূনতম প্রতিদিন এক লক্ষ লোককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে, জানতে হবে মানুষের সংক্রমণ কীভাবে বাড়ছে আর তাকে কীভাবে সামাল দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার সুবিধা বাড়াতে হবে। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাউকেই আর চিকিৎসা সুবিধা না-দিয়ে মৃত্যুর কবলে পাঠানো যাবে না। সরকারকে বুঝতে হবে চিকিৎসা পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। লক-ডাউন যেন সুফল লাভের লক্ষ্যে করা হয়, মানুষকে যেন অর্থহীনভাবে ঘরে বন্দি না-করে রাখা হয়। লক-ডাউন যেন করা হয়, মানুষকে আর লক-ডাউনে থাকতে হবে-না, সেইরকম চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা যা যা বলেছেন, সেই সূত্র ধরে বলতে পারি, সরকারকে পরিকল্পনা নিতে হবে, আগামী তিন মাসের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিন দশ জনে নামিয়ে আনতে হবে। ছয় মাসের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে শূন্যের কোঠায়। সরকার তা করতে চাইলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী পুরো জাতিকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত পরামর্শকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সেইসঙ্গে সংক্রমণ প্রতিরোধে যেসব দেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজনে সেইসব দেশের সহায়তা বা সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

লক-ডাউনে থাকার সুফল হয়তো আছে কিন্তু এর কুফল নিয়ে কি কখনো ভেবে দেখা হয়েছে? চিকিৎসাবিজ্ঞানের মনীষীরা বলেন, বিচ্ছিন্নতা আর একাকিত্ব ভয়াবহ রোগ ছড়ায় মানুষের ভেতরে, সেটাও এক ধরনের ভাইরাসের মতোই। মানুষের অজান্তেই তা মানুষের শরীর আর মনে ধ্বংসের বীজ পুঁতে দেয়। ফলে মানুষের জিন-চরিত্রের বদল ঘটে যায়, ধেয়ে আসে নানান রোগ। একটা সমস্যার সুরাহা করতে গিয়ে আরো দশটা নতুন সমস্যা তখন তৈরি হয় এটাও বিখ্যাত এক দার্শনিকের কথা। কথাটা মিথ্যা নয়। ব্রিটিশদের তৈরি করা ভারতের আন্দামান দ্বীপের কারাগারে বহু সাহসী বিপ্লবী একাকিত্বের যাতনায় আত্মহত্যা করেছিলেন। যাঁরা মানুষের জন্য লড়াইয়ে জীবন দিতে ভয় পাননি, তাঁরা কারাগারের একাকিত্ব মেনে নিতে পারেননি। ফলে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। মানুষকে যদি মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া বাঁচতে হয়, সেটা কেমন বাঁচা? যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের মৃত্যুটাই-বা কেমন। হয়তো শেষবয়সে মানুষ মৃত্যুভয় নিয়ে ততটা ভাবে না। মৃত্যুর সময় নিকট-আত্মীয়দের কাছে পেতে চায়। নিকট-আত্মীয়রা কাছে থাকতে চায়। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মৃত্যুকে নানাভাবে আরো যন্ত্রণাদায়ক করে তোলা হচ্ছে। কেউ কেউ মৃত্যুর আগে প্রিয়জনদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছেন না। প্রিয়জনেরা মৃত্যুর পর তাঁর কাছে যেতে পারছেন না।

মানুষ করোনা আক্রান্তের ভয়ে ভীত এই কারণে যে, একবার আক্রান্ত হলে সকলে তাকে ত্যাগ করবে। সেই ভয়ে তার সমস্ত মনোবল ভেঙে পড়ছে। মানুষ মনোবল হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অনেকে হয়তো করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন শুধু আতঙ্কে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে হয়তো তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যখন মারাত্মক রোগে মানুষের অন্যকে কাছে পাবার কথা, ঠিক তখনি তাঁকে ছেড়ে সকলে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে এর চেয়ে করুণ অধ্যায় কী হতে পারে! মানে এরকম একটা সময় কি দীর্ঘদিন চলতে দেয়া যায়? মানুষকে তার ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দেবে। কর্মচঞ্চল বহু মানুষ এখন এমনিতেই নিস্তেজ, যদি দীর্ঘদিন তার বন্দিদশা চলতে থাকে, মানুষ ভেতরে ভেতরে আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ফলে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন্ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অবস্থার অবসান ঘটাতে চায় রাষ্ট্র। কিছুতেই প্রক্রিয়াটাকে আর বেশি লম্বা বা দীর্ঘ করা যাবে না। সবকিছু বাদ দিয়ে ভাইরাসের ভয়ে মানুষ কতদিন গৃহবন্দি হয়ে থাকবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষ কি বছরের পর বছর গৃহবন্দি থাকতে পারবে? থাকা কি সম্ভব? মানুষ কি কাজকর্ম-চাষাবাদ বাদ

দিয়ে ঘরে বসে বেঁচে থাকার সকল রসদ জুটাতে পারবে? লক-ডাউনের শেষ ভরসা তবে কী? লক-ডাউন ছাড়াই-বা চলার পথ কী? সরকারকে সুনিদিষ্টভাবে তা বলতে হবে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে হোক আর অভিজ্ঞ দেশের মতামত নিয়েই হোক। জনগণ বেশিদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে পারে না।

বিশ্বে বিভিন্ন ভাইরাস আছে এবং থাকবে। মানুষকে তার মধ্যেই টিকে থাকতে হবে। চালর্স ডারউইনের সেই কথাটাই আবার সত্য হবে, যোগ্যরাই টিকে থাকে। মানুষকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বেড়ালে হবে না, ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শারীরিক এই সক্ষমতা অর্জন কঠিন কিছু নয়। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম করা। চিকিৎসাবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই যা বলেছে আর তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর চুরাশি-পঁচাশি শতাংশ মানুষ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকতে সক্ষম। ফলে করোনা ভাইরাসটি খুব শক্তিশালী কিছু নয়। প্রতি বছর কিছু মানুষ তো নানাভাবেই মারা যাবে। সে-সব নিয়ে এতদিন তো আমরা দুশ্চিন্তা করিনি। কিন্তু করোনা-র ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলাম কেন? মাত্র পাঁচ-ছয় শতাংশ মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্নে চুরাশি শতাংশ মানুষকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। করোনা-র আক্রমণে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে বড়-একটা সংখ্যাকেই হয়তো বাঁচানো যেত, যদি হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেনের অভাব না-ঘটত। বাকি যে দু-শতাংশ মানুষ যাঁরা শারীরিকভাবে আরো ভঙ্গুর বা বেশি সংকটজনক, নিশ্চয় তাঁরা ঘরে থাকবেন নিজেদের স্বার্থেই। নিশ্চয় সে-সব মানুষকে ঘরে সাবধানে রাখাটা কঠিন কিছু হবে না। হয়তো বয়সজনিত কারণে এঁদের একটা অংশ ঘরেই থাকেন। কিন্তু দু-শতাংশ মানুষের জন্য সকলকে বন্দি করে রাখার মানে হয় না। নব্বই শতাংশ মানুষের করোনা-র আক্রমণে কিছুই দরকার হচ্ছে না। নব্বই শতাংশ মানুষ তবে কাজকর্ম ফেলে ঘরে বসে থাকবে কেন? বিশ্বটাকে কেন মনে করবে কারাগার? নিজেদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করবেন তাঁরা, যখন যেখানে আক্রান্ত হন দেশে কিংবা বিদেশে, আক্রান্তরা সেখানেই, তা দেশে হোক বা বিদেশে হোক প্রয়োজন হলে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাবেন। বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এখন সকলের জন্য থেকে সেরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সব বিচারে অক্সিজেন সরবরাহ করাটা করোনা ভাইরাসের প্রধান চিকিৎসা সেটা ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে। বাসায় বা হাসপাতালে নানাভাবে সেটার ব্যবস্থা করা যায় সংকটজনক রোগীদের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর জন্য নতুন একটা অভিজ্ঞতা এটা, হাসপাতালে অক্সিজেন দেয়ার সুবিধা বাড়াতে হবে। সরকারি হাসপাতাল বাড়াতে হবে আর সেখানে প্রয়োজনমতো অক্সিজেন দানের সুযোগ থাকতে হবে। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়ে অনেকটা বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে সত্তর লক্ষ বেকার ছিল। বহুদিন পর্যন্ত সে সঙ্কটের সমাধান হচ্ছিল না। বড় বড় রাজনীতিকেরা যা পারেননি, হিটলার নিজের পরিকল্পিত যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্মহীনদের নানারকম কাজে নিয়োগ দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করেছিলেন। তিনি বিরাট এক সামরিক বাহিনী বানিয়ে ফেলেছিলেন। হিটলার এমনিতেই এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। কিছু কারণ ছিল। হিটলারের মতো আমি সেনাবাহিনী বাড়াবার কোনো পরামর্শ দিচ্ছি না। কথাটা একটা উদাহরণ মাত্র। কিন্তু শিক্ষক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা তো বাড়ানো যেতেই পারে। তার দরকারও রয়েছে। বাইরের থেকে পণ্য আমদানি কমিয়ে সেসব পণ্যের কারখানা দেশে প্রতিষ্ঠা করলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা বা বিভিন্ন রকম গবেষণার জন্য দেশের মেধাবীদের যুক্ত করতে হবে। কারণ প্রয়োজনীয় সব আবিষ্কার নিজের ঘরেই হতে হবে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান কিট কিংবা কিছু আবিষ্কার করলে, সেটার সকল দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল মেধার পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। দুর্বলতা থাকলে সেটা বাতিল না-করে উন্নত করার জন্য সহায়তা দিতে হবে। বিশ্বে এভাবেই বড় বড় বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশও এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বড় বড় অবদান রাখতে পারবে। বাংলাদেশের মেধাবীরা অন্য দেশে গিয়ে অনেক কিছু করতে পারলে নিজ দেশে না-পারার কিছু নেই।

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মানসম্পন্ন চিকিৎসলয় প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়ে স্বাস্থ্য-সেবা বাড়ালে মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তা হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের মান বাড়বে, তাদের প্রাণশক্তি এবং কর্মক্ষমতা বাড়বে। রাষ্ট্রের চেহারাটাই তা হলে পাল্টে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে উৎপাদন। বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে যখন বেকারত্ব কমে যাবে, নানারকম বিশৃঙ্খলা কমে আসবে। সকল সেবামূলক খাতে, পরিবহন ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত উৎপাদনে সর্বত্র লক্ষ করা যাবে সুশৃঙ্খলা। রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কমে যাবে। সকল রকম সন্ত্রাস বা নৈরাজ্যমূলক কর্মকা- হ্রাস পাবে। করোনা ভাইরাস অন্তত এটাও দেখিয়েছে, প্রতিটি দেশকে যতটা সম্ভব নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে গেলেই, একই সঙ্গে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। মানুষের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। কর্মসংস্থানের খাতগুলো সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে। কর্মসংস্থান কেমন করে একটি দেশের চেহারা পাল্টে দেয় তার বিরাট উদাহরণ হল, প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি। ঘটনাটা হিটলারের হাত দিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সেটা শিক্ষণীয় সকলের জন্য। হিটলার সেটাকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করেছিল, কিন্তু মঙ্গলজনক কাজেও তা ব্যবহার করা যায়।

করোনা সংক্রান্ত কারণে অর্থনৈতিক নানা বিপদ কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে জার্মানির উদাহরণ দিয়েই শেষ করা যাক। নিঃসন্দেহে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জার্মানি। যুদ্ধে জার্মানরা পরাজিত হয়। ফলে যুদ্ধের নানা দায়-দায়িত্ব জার্মানিকে বহন করতে হয়, বিশেষ করে যুদ্ধ বাধানোর দায়ে ক্ষতিপূরণ দান তাদের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ফ্রান্সের প্রস্তাব ছিল জার্মানি বিয়াল্লিশটি বাৎসরিক কিস্তিতে এক হাজার একশো বিশ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় উনিশশো একুশ সালের মে মাসে জার্মানির জন্য মোট দেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় ছয়শো ষাট কোটি পাউন্ড। জার্মানি তার প্রথম কিস্তি পাঁচ কোটি পাউন্ড শোধ করল। তিন বছরের শর্তে এটাই ছিল তার নগদ অর্থে দেয় পরিশোধ। জার্মানির পক্ষে পরবর্তী ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। জার্মানি মিত্রশক্তিকে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ফ্রান্স জার্মানির ধাতুশিল্পের কেন্দ্রস্থল এবং কয়লা, অশোধিত লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা আশি ভাগ যেখানে পাওয়া যেত, সেই রূঢ় অঞ্চল দখল করে। রূঢ় অঞ্চল দখলের পর জার্মানির সার্বিক অর্থনৈতিক জীবন থমকে দাঁড়াল। এর পরিণতিতে জার্মানিতে চরম মুদ্রাসংকট দেখা দেয়।

বিশ সালের মাঝামাঝি মার্কের মূল্যমান তার স্বাভাবিক হার এক ডলারের বিনিময়ে বিশ মার্ক থেকে নেমে দাঁড়াল পাউন্ড প্রতি দুশো পঞ্চাশ মার্ক। একুশ সালের মাঝামাঝি তা বেড়ে দাঁড়াল এক পাউন্ড সমান এক হাজার মার্ক। তেইশ সালে পাউন্ড প্রতি পঁয়ত্রিশ হাজার মার্ক পাওয়া যেত। সে সময় মাত্র কয়েক পেন্সের বিনিময়ে জার্মানিতে রাজার হালে জীবনযাপন করা যেত বা যে কোনো বিদেশি মাত্র কয়েক শিলিংয়ের বিনিময়ে জার্মানির সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে পারত। তেইশ সাল শেষ হবার আগেই মার্ক-এর মূল্যমান আরো নেমে গিয়ে এক ডলার সমান দাঁড়াল বিরাশি কোটি মার্ক। সে সময় এক জোড়া জুতার জন্য পঞ্চাশ লাখ মার্ক দিতে হত, ছাপাখানায় মুদ্রিত একটি সংবাদপত্রের জন্য দিতে হত বিশ লাখ মার্ক। সুটের একটি কাপড় সংগ্রহের জন্য বিশ সপ্তাহ কাজ করতে হত। জার্মানির অবস্থা এমন দেউলিয়ার পর্যায়ে গিয়েছিল যে জার্মানির রাইখস ব্যাংককে টাকা সরবরাহের জন্য তিনশো কাগজের মিল এবং বিশ হাজার ছাপাখানা বসাতে হয়েছিল। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলত। বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধের পর জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিটলার সেই অবস্থা থেকে জার্মানির আর্থিক সঙ্গতি এমন জায়গায় নিয়ে যায়, এমন বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে আর যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে সকলকে এমনভাবে ছাড়িয়ে যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম চার বছর জার্মানিকে কেউই যুদ্ধে হারাতে পারেনি।

ফলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার নানা রাস্তা থাকে। কৃষিকে রক্ষা করা আর কর্মসংস্থান তৈরি করা তার প্রধান একটি দিক। জনগণের স্বাস্থ্য সেক্ষেত্রে প্রধান আর একটি বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুরনো আমলাতন্ত্র দিয়ে, পুরনো রাজনৈতিক কৌশল দিয়ে আর বিরাট কিছু অগ্রগতি হবে না। সম্পূর্ণ নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। সারা বিশ্ব জুড়েই এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা

পাওয়া যাবে। সারা বিশ্বে অনেকে নিজেদের অর্থনীতির পুনর্মূল্যায়ন করছে। বহু রাষ্ট্রই বর্তমাস সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে নতুন করে সাজাবে। বাংলাদেশকে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বা পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। করোনা বিশ্বের জন্য নতুন কী পরিবর্তন আনবে? হয়তো খুব বেশি কিছু নয়। করোনা ভাইরাস রাতারাতি মানুষের সকল চিন্তাকে পাল্টাতে পারবে না। বিরাট পরিবর্তনের জন্য দরকার ঠা-া মাথায় বসে সুস্থ চিন্তা আর সঠিক পরিকল্পনা করা। নিশ্চয় সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এটা ঠিক, মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিবর্তন তো আসবেই। বিভিন্নমুখী নানা ছোটখাটো পরিবর্তন নজরে পড়বে। করোনা-র এই সংক্রমণকে ঘিরে পাওয়া যাবে বড় মাপের অনেক সাহিত্য। নিশ্চয় পাওয়া যাবে নতুন দর্শনের আলোচনা। মানুষকে সামনের দিকে তাকাতে তা বাধ্য করবে। কিন্তু পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব থেকে যাবে আরো কিছু কাল। সেইসঙ্গে মানবিক রাষ্ট্র, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা মানুষের চিন্তায় নিশ্চয় আগের চেয়ে অনেক বেশি উঁকিঝুঁকি দেবে। নতুন ভাইরাসের আতঙ্ক থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে নতুন স্বপ্ন দেখাবে।

[লেখকঃ প্রাবন্ধিক, গবেষক ।]

করোনা, জীবন ও প্রকৃতি / লেলিন চৌধুরী

লে নি ন চৌ ধু রী

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন '

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট কাষ্ঠ ও প্রস্তুর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও হে তপোবন পুণ্যচ্ছায়া রাশি
গানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি ।...
চাই স্বাধীনতা,চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃৎস্পন্দন ।'

(সভ্যতার প্রতি) ।

অরণ্য জীবন ধ্বংস করে সেখানে 'পাষাণপিঞ্জর' গড়ে 'রাজভোগ' গ্রহণের দ্বারা মানুষের জীবন কল্যাণে স্থিত হবেনা । তাই সভ্যতার বুলডোজারের আঘাতে বনভূমি উজাড় হতে থাকলো । অরণ্যজীবনের সাথে মানবজীবনের ভারসাম্য ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হলো । ফলে অরণ্যবাসী সকল প্রাণ মানুষের উপর চড়াও হতে শুরু করে । তাতে আরো অনেক কিছুর সাথে মানুষের রোগশোক বাড়তে থাকলো । এরকম একটি রোগ হলো করোনা বা কোভিড১৯ দ্বারা সংঘটিত মহামারী । চলমান করোনা মহামারীর সাথে পরিবেশ বিপর্যয়ের আন্ত ঃসম্পর্ক অনুধাবন ও উদ্ঘাটনের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Program (UNEP)) একদল বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব প্রদান করে । তারা কোভিড১৯ সংক্রমণের ছয়টি কারণ নির্ণয় করেছে । সেগুলো হলো-

১. মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণী এখন অরণ্যজীবন ও বাস্তুতন্ত্রে অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে । গৃহপালিত পশুপাখি এখন বনের রোগকে মানুষের মধ্যে ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে ।
২. মানুষের কার্যকলাপের জন্য বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে । এরফলে অরণ্যবাসী রোগজীবাণুর জন্য নতুন আবাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।
৩. কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে ।
৪. মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য যে ধরনের বাস্তুতন্ত্র(ecosystem) দরকার মানুষের কার্যকলাপে সেটি বিনষ্ট হয়েছে ।
৫. সকল প্রাণের আবাসের জন্য প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem Integrity) । এখানে মানুষ ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করছে ।
৬. যদি সবকিছু এভাবে চলতে থাকে তাহলে ঘন ঘন মহামারী দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে ।

দুই.
বিশ্বের অন্যসব দেশের মতো বাংলাদেশও করোনাক্রান্ত । কোভিড১৯-র তান্ডবে জনজীবনের তাল ও ছন্দ কেটে গিয়েছে । একদিকে অসংখ্য মানুষের অসুস্থতা ও ভোগান্তি, বিপুল সংখ্যক মৃত্যু এবং ঘরবন্দী জীবনের অবসন্নতা অন্যদিকে কর্মহীনতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং সর্বোপরি ক্ষুধা - এদুয়ের যৌথ আঘাতে মানুষ ও মানবিকতা ঘোরদুর্যোগে নিপতিত । বাংলাদেশে করোনাকালের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিনমাসের কাছাকাছি । এই সময়কালে নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ থেকে করোনাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কতোগুলো বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে এসেছে । সেগুলো হচ্ছে - ক. যারা খালি গায়ে, খালি পায়ে খোলা মাঠে হালচাষ করে তাদের করোনাক্রান্ত হওয়া বিরল । গার্হস্থ্যকর্ম ও গার্হস্থ্যকৃষিতে নিয়োজিতদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য । খ. শহরে রিক্সাচালক, ঠেলাচালক এবং যেসব শ্রমজীবী রোদে-বাতাসে কাজ করে তাদের মধ্যেও করোনার প্রাদুর্ভাব দূর্লভ । গ. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বড়ো শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা অতিনগণ্য । ঘ. বিত্তবানদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ বেশি । শিক্ষিত চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী ও আয়েশী জীবনে অভ্যস্তরা করোনার প্রধান শিকার হচ্ছে । এছাড়াও যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানে দীর্ঘসময় কাজ করে এবং কর্মকালে কৃত্রিম আলোর নীচে অবস্থান করে তাদের মধ্যেও আক্রান্ত বেশি ।

তিন.
পর্যবেক্ষণকে কাঠামোবদ্ধ করার প্রয়াসে আমরা কতোগুলো নির্ণায়ক স্থির করি । অতঃপর সেই নির্ণায়কগুলোর আলোকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকারী মানুষের তথ্যাদি যাচাই করি । ঢাকা মহানগর, ঢাকার রিক্সাচালক, ঠেলাগাড়ি চালক, কুলিমজুর, ফুটপাতের ভাসমান দোকানদার, কড়াইল বস্তি,কল্যাণপুরের পোড়াবস্তি,মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধবস্তি, চট্টগ্রাম শহরাঞ্চলের বস্তি, মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলা, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলা, কুষ্টিয়ার দর্শনা ও তৎসংলগ্ন সীমান্ত এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় । করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির পেশা ও কাজের ধরণ,দীর্ঘদিন বাসস্থান, অসংক্রামক রোগের উপস্থিতি, এসি ও ফ্রিজ ব্যবহার -- মূলতঃ এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয় । অসংক্রামক ব্যাধি, শারীরিক শ্রম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত খাদ্য,কৃত্রিম আলো,সূর্যালোক,খোলা বাতাস, রাসায়নিক বিষমুক্ত খাদ্য, মাটির সংস্পর্শ--এই নির্ণায়কগুলো দ্বারা বাংলাদেশের করোনাক্রান্তদের প্রাথমিক বিশেষণ তৈরি করা হয় । নির্ণয়াকগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয় । প্রথম পাঁচটির সাথে করোনা সংক্রমণের সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যায় । জীবনযাপনে এই পাঁচটি নির্ণয়াকের প্রভাব যাদের যতো বেশি তাদের মধ্যে করোনাসংক্রমন ও করোনায় মৃত্যুহার ততো বেশি । যাদের জীবনযাপনে শেষ চারটি নির্ণায়ক মূল ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে করোনার প্রকোপ অতিসামান্য । প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের রোগ প্রতিরোধ তৈরি হয় । একটি পরিবেশ থেকে অন্য

পরিবেশে গিয়ে বসবাস শুরু করলে মানুষ নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে থাকে। তখন নতুন পরিবেশের নির্ণায়ক দ্বারা তার দেহ ও মনের সামগ্রিকতা প্রস্তুত হয়। এটি অতিদ্রুত বা কয়েকদিনে হয়ে থাকেনা। ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া বহমান থাকে। এজন্য দেখা যায় গ্রামের একটি কৃষক পরিবারের এক ভাই মাঠের জমিতে চাষাবাদ করে তার করোনা হচ্ছেনা। কিন্তু তারই অন্য ভাইটি মধ্যপ্রাচ্যে অথবা নিউইয়র্কে অভিবাসী জীবনযাপন করছে। তার কিন্তু করোনা সংক্রমণ দ্রুত হচ্ছে।গ্রামবাসী ভাই এবং অভিবাসী ভাই দুজনেই বংশগতভাবে একই ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কিন্তু জীবনযাপনের পরিবেশের কারণে তাদের নির্ণায়কগুলো পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাই জীবনযাপনের প্রতিবেশ ও পরিবেশ করোনা সংক্রমণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। পুরো বিষয়টি একটি পর্যবেক্ষণলব্ধ সরল সিদ্ধান্ত।এটি মোটেই রিসার্চ মেথডোলজি অনুযায়ী সম্পন্ন করা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তগুলোর পূনঃপরীক্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চার.

পশু ও সমগ্র প্রাণীকুল থেকে মানুষের ভিন্নতা সূচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মস্তিষ্কের কারণে। মহাজাগতিক ও জাগতিক অগণন অচিন্তনীয় ঘটনাপঞ্জীর একটি হলো মানবমস্তিস্কের ক্রম-উন্নতি। এই উন্নত মস্তিষ্কের কারণে মানুষ অর্জন করেছে পর্যবেক্ষণ ও বিশেষণ ক্ষমতা। মানুষের স্বপ্ন দেখা ও কল্পনা করার অপরিমেয় ক্ষমতার ভিত্তিও হলো মস্তিষ্ক। এই চারের সমন্বয়ে মানুষ সভ্যতা নির্মাণে প্রয়াসী হয়। মেধাচালিত শ্রম দ্বারা এই প্রয়াস বাস্তবায়নের পথ-মানচিত্র খুঁজে নেয়। মানুষ তার নির্মিত সভ্যতাকে নির্মমভাবে 'অতি মানবকেন্দ্রিক' করে গড়ে তুলে। অতি মানবেন্দ্রিকতা এতো বীভৎস রূপ নেয় যে নিজের জ্ঞাত মানবগোষ্ঠীর বাইরের মানুষকেও মানবেতর ভেবে তাদেরও নির্বিচারে নির্মূল করেছে। আমেরিকার মূলবাসী লাল ভারতীয়, আদি অষ্ট্রেলীয়, কালো আফ্রিকাবাসী এখনো দগদগে ক্ষতের মতো আমাদের অশ্রু ঝরায়।যুদ্ধ,ধর্ম,রাষ্ট্র, সীমান্ত,আইন ইত্যাদি নানা নামে এখনো ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চলমান। অগ্রসরমান সভ্যতার রথের চাকাতলে পিষ্ট হতে থাকে প্রকৃতির সাজানো বহুবৈচিত্র্যময় জীবন ও জড়ের সমাহার।প্রকৃতির বিন্যাসকে বিপর্যস্ত করে, প্রকৃতির অগণন সদস্যকে বিলুপ্ত করে সভ্যতার অট্টালিকা নির্মিত বিনির্মিত হয়েছে। অহংকারের দুঃসহ তান্ডবে সকল প্রাণ এবং জড়কে ক্রমাগত আঘাত ও ধ্বংস করে যাচ্ছে মানুষ।পাহাড়পর্বত, বনভূমি, সমুদ্র ও সমুদ্রতল, বায়ু এমনকি মহাশূন্য পর্যন্ত মানুষের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাচ্ছেনা। প্রকৃতির বিন্যাসকে পদদলিত করে, বদলে দিয়ে মানুষ নিজের স্বকপোলকল্পিত আয়েশের প্রাসাদ গড়ে তুলেছে। ক্ষুব্ধ প্রকৃতি রোষানলে জ্বলে উঠেছে। সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, মহামারী রূপে প্রকৃতি বারবার আঘাত করেছে। দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর মানুষ আবার সর্বনাশের আয়োজনে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। এযেন দীপশিখা সম্মোহিত পতঙ্গের উড়ালযাত্রা, আত্মহননের বিরতিহীন প্রয়াস। এবারের কোভিড১৯-র মহামারীটি ভিন্ন ধরনের। এটি আঘাত করেছে একেবারে ভিন্ন জায়গায়। সুরক্ষিত দূর্গে বসবাস করছে এমন ভাবনায় যারা বুঁদ হয়েছিলো এবার তারাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃত্রিম আলোর নীচে বসবাসরত ভোগী বিত্তবান অমরত্বের ভাবনাবিলাসে মত্ত ছিলো। মাঠেঘাটে হালচাষ করা নগ্নপদ নগ্নগাত্র মানুষগুলোর দিকে তাকাতো নিদারুণ অবজ্ঞায়। সহসা করোনা বাতাস বয়ে গেল তাদের বুকের উপর দিয়ে। সভ্যতার ইতিহাসে 'সুখভোগী' মানুষেরা চাষাভুষাদের মাটিগন্ধী জীবনকে অন্তত একবারের জন্য হলেও ঈর্ষা করতে বাধ্য হলো।

পাঁচ.

মানুষের কার্যফলে প্রকৃতি এখন অসুস্থ।প্রকৃতির অসুখ করলে মানুষেরা ভালো থাকেনা। সভ্যতার গতিপথে পরিবর্তনের চুড়ান্ত সময় সমাগত। আমাদের ঠিক করতে হবে-- কোন পথে যাবো? একটি পথ হলো প্রকৃতির বিন্যাসের সাথে সাযুজ্য রেখে পরিবেশের সন্তান হিসাবে জীবন ও সভ্যতাকে অগ্রসর করে নেয়া। অন্যটি হলো-- অহংকারের উন্মত্ত তান্ডবে পরিবেশ প্রকৃতিকে পদদলিত করে যে-ভাবে মানুষ চলছে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। ' --ওরে তুই ওঠ আজি!/আগুন লেগেছে কোথা?কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি/ জাগাতে জগত -জনে?কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে/শূন্যতল? কোন অন্ধকার মাঝে জজ্ঞর বন্ধনে/অনাথিনী মাগিছে সহায়?...../অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,/চাই বল,চাই স্বাস্থ্য, চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, / সাহসবিস্তৃত বক্ষপট!'(এবার ফিরাও মোরে/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আমরা কি ফিরবো? ফিরতে পারবো?

(ই-মেইল: Choudhurybd16@gmail)

অনুবাদ

কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি- কখন? এবং কীভাবে?

জিনা কোলাটা/ অনুবাদ আবু মোহম্মদ ইউসুফ

ইতিহাসবিদেরা বলেন রোগ সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব নানাভাবেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে কাদের জন্য এটা সমাপ্ত হয় এবং কার সিদ্ধান্তে?

ইতিহাসবিদদের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, কোন বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি দু'টি পথের যে কোন একটি পথ একটি সিসিলি'র ফ্রেস্কো। ১৪৪৫ সনের পূর্ববর্তী শতাব্দীতে 'কালো মৃত্যু (বিউবোনিক প্লেগ) এর সংক্রমণে ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু হয়।

অনুসরণ করে হয়ে থাকে। একটি পথ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফল টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কারের

মাধ্যমে যখন রোগ সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা নেমে আসে। অথবা সামাজিকভাবে, যখন সমাজে রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বা আতঙ্কের মহামারী কমে আসে।

রোগতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, যখন মানুষ প্রশ্ন করে কখন বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি ঘটবে তখন এটাই ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে তারা বিশ্বমহামারীর সামাজিক সমাপ্তির কথাটাই জানতে চাইছেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি এভাবেও ঘটতে পারে যখন এটা নয় যে নতুন ওষুধ আবিষ্কার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজে রোগটির সমাপ্তি ঘটেছে বরঞ্চ, মহামারীর কারনে সৃষ্ট আতঙ্কাবস্থায় থাকতে থাকতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং রোগটির সাথে বসবাসের শর্তগুলো শিখে নিতে বাধ্য হয়েছে।

আজকাল, আমরা প্রতিদিন কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারী পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লকডাউন নীতির কারনে সৃষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি খুলে দেয়ার চাপের মুখে নানারকম তর্ক-বিতর্ক হতে দেখছি।

এসব তর্ক-বিতর্কের মাঝে অনেকের এই ধারণাটাই বেশী করে সামনে উঠে আসছে যে- বিশ্বমহামারীর তথাকথিত সমাপ্তি চিকিৎসাবিজ্ঞান অথবা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য দ্বারা নির্ধারিত হবে না-কি এটা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

বিশ্বমহামারীর সমাপ্তির বিষয়টা সত্যি খুব গোলমেলে। ইতিহাসের পেছন দিকে ফিরে তাকালে খুব সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য অথবা বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ্বে এক একটা ঘটে যাওয়া মহামারী কখন কাদের ক্ষেত্রে শেষ হয়েছে এবং সেটা কখন, কার ঘোষণায় সমাপ্তিতে পৌঁছেছে এসব জানার ক্ষেত্রে অকাট্যভাবে প্রমানিত সুত্রের বিস্তর অভাব রয়েছে।

ভয় ও আতঙ্কের পথে-

বাস্তবে রোগাক্রান্ত না হয়েও রোগাক্রান্ত হওয়ার সন্দেহ অথবা আতঙ্কের মহামারী হতে পারে। আয়ারল্যান্ডে ২০১৪ সালে এরকম হতে দেখা দিয়েছিল।

তার কয়েকমাস পূর্বে পশ্চিম আফ্রিকায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ছোঁয়াচে এবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১১,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। একসময় এবোলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের সংখ্যা প্রাকৃতিকভাবেই কমে আসছিল এবং যদিও আয়ারল্যান্ডে কোন সংক্রমণের ঘটনাই ঘটেনি তবুও আয়ারল্যান্ডবাসী এবোলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের ভয়ে অযথাই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে সঞ্চারিত এবোলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার গণ-হিস্টেরিয়ায় দারুণভাবে ভুগছিল যখন প্রকৃতপক্ষে আয়ারল্যান্ডবাসী কোন কৃষ্ণাঙ্গই এবোলা ভাইরাসে সংক্রমিত ছিল না।

সে সময় ডাবলিন হাসপাতালের সবাইকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। হাসপাতালের কর্মীরা চরম উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কগ্রস্থ ছিল এই শঙ্কায় যে যথাযথ সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে তারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে। তাই যখন এবোলায় আক্রান্ত একটি দেশে ভ্রমণ করার ইতিহাস আছে এমন একজন রোগী অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে ডাবলিন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে হাজির হয় তখন হাসপাতালের কেউ তার কাছে যেতে অস্বীকার করে এবং হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়।কিন্তু, এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে হাসপাতালের অন্য একজন ডাক্তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেই রোগীকে পরীক্ষা করেন এবং দেখতে পান যে, রোগীটি প্রকৃতপক্ষে সর্বশেষ পর্যায়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল। হাসপাতালে ভর্তি

হওয়ার কয়েকদিন পরেই রোগীটি মারা যায় এবং পরীক্ষা করে দেখা যায় যে রোগীটি এবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, আজ পর্যন্ত এবোলা ভাইরাস প্রতিরোধের কোন টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া সত্ত্বেও ২০১৪ সনে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' এবোলা বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করে এটাকে জরুরী স্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্বেগের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

আমরা যে কোন ভাইরাস মোকাবেলার মতো করেই জনগনের মাঝে ছড়িয়ে পড়া আতংক অথবা অজ্ঞতাকে যদি সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে যেখানে একটি সংক্রমণের ঘটনাও ঘটেনি তবুও সেখানে সমাজের প্রান্তিকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এসব ভয়ের মহামারীর আরো অধিক ক্ষতিকর ফলাফল আমরা দেখতে পাই যখন সেই ভয়ের মহামারী আরো জটিলভাবে জাতি, বর্ণ, ভাষা ও অধিনস্ত জনগোষ্ঠিকে নেতিবাচকভাবে জড়িয়ে ফেলার প্রবণতা পায়।

কালো মৃত্যু ও কালো স্মৃতি-

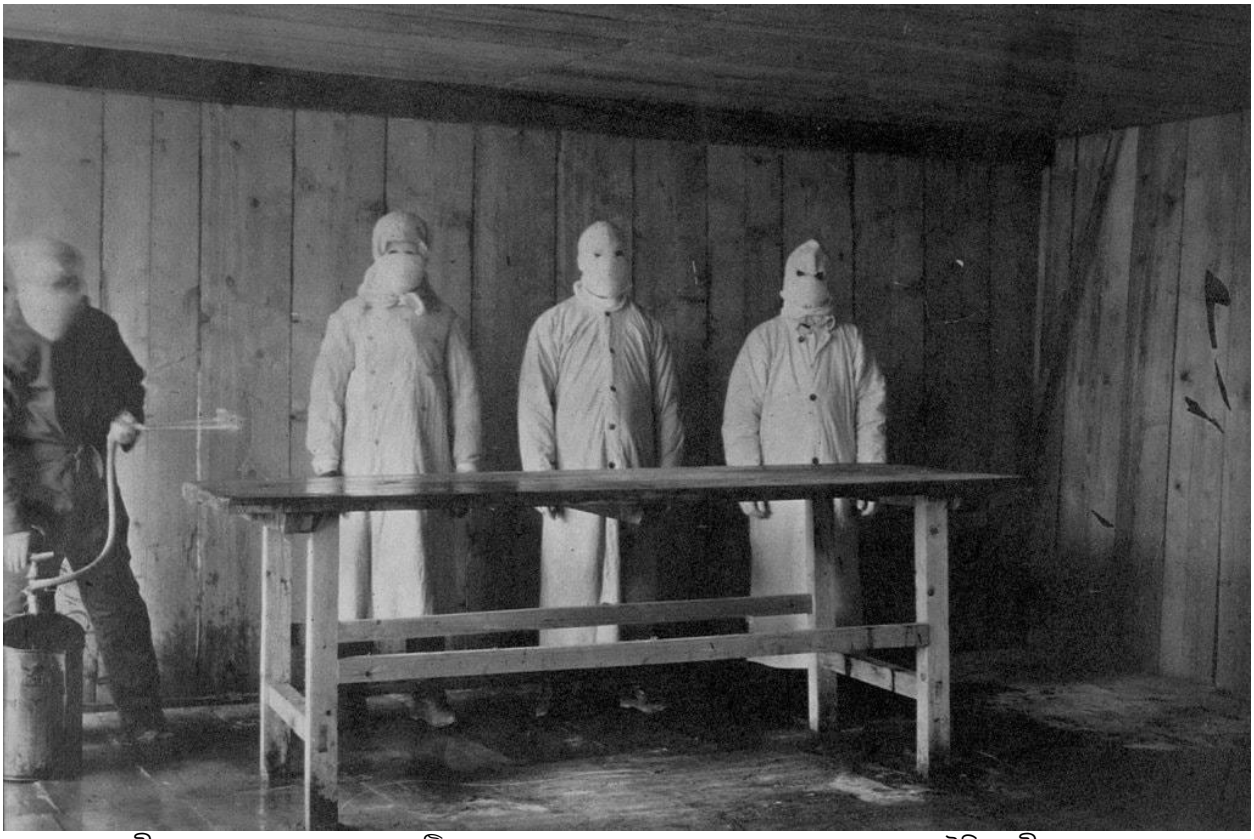

১৯১০ সনে চীনের মুকাডেন শহরের একটি প্লেগ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য ব্যবহৃত টেবিল জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে।

গত ১৫০০ বছরে বহুবার 'বিউবোনিক' প্লেগের সংক্রমণ ঘটেছে এবং যেসব সংক্রমণে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষেরই যে মৃত্যুই ঘটেছে তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্লেগের সংক্রমণের ফলে ইতিহাসের বাঁক বদল ঘটতেও দেখা গেছে। প্রতিবারের সংক্রমণের পর পরবর্তী সংক্রমণ, সংক্রমিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আতঙ্কের তীব্রতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। বিউবোনিক প্লেগে সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ফুলে যেতো

এবং গায়ের বর্ণ কালো হয়ে যেতো। তাই এই প্লেগটিকে "কালো মৃত্যু" নামে উল্লেখ করতেও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিউবোনিক প্লেগ নামের রোগটি এক প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার কারনে ঘটেছে। যার নাম 'ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস'। এই ব্যাক্টেরিয়াটি ইঁদুরের শরীরে বসবাসকারী এক ধরণের মাছিতে থাকে। কিন্তু, বিউবোনিক প্লেগ সংক্রমিত ব্যক্তির লালা কণার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, তাই ইঁদুর নিধনের মাধ্যমে এই প্লেগ বিদুরিত হয় না।

ইতিহাসবিদেরা, বিউবোনিক প্লেগের তিনটি বড় ঢেউ এর কথা উল্লেখ করেছেন।এই প্লেগের প্রথম সংক্রমণ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা যেয় এবং যেটা জাস্টিনিয়ান প্লেগ নামে পরিচিতি পায়। মধ্যযুগে চৌদ্দশ শতাব্দীতে বিউবোনিক প্লেগ পুনরায় ফিরে আসে এবং তারপর সেটা আবার ফিরে আসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর বিউবোনিক প্লেগটি কন্সটেন্টিনোপলের রোমান রাজা জাস্টিনিয়ান এর নামে নামকরণ করা হয় কেননা রাজা জাস্টিনিয়ানই প্রথম এই রোগে আক্রান্ত হন যদিও তিনি পরে সুস্থ হয়ে উঠেন।

৫৪১ থেকে ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্লেগের সংক্রমণের ফলে ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ, তৎকালীন বাইজেন্টাইন ও কনস্টেন্টিনোপল সাম্রাজ্যভুক্ত সকল এলাকা, মিশর এবং আরব উপদ্বীপে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠীর প্রাণহানী ঘটে।

এর পর মধ্যযুগে ১৩৩১ সালে চীন থেকে বিউবোনিক প্লেগের বিশ্বমহামারী দ্বিতীয়বার শুরু হয়। প্লেগের এই মহামারী এবং পাশাপাশি চলমান গৃহযুদ্ধে তখন চীনের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু ঘটে। ক্রমে চীন থেকে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে তখনকার বিশ্ববাণিজ্যের গমনপথ ধরে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায়।১৩৪৭ সাল থেকে ১৩৫১ সাল, এই চার বছরে ইউরোপের ন্যুনতম এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠির মৃত্যু হয়। শুধুমাত্র সিয়েনা এবং ইতালীতে বিউবোনিক প্লেগে মৃত্যুর হার ছিল প্রায় অর্ধেক।

এগনোলো ডি টুরা নামে চৌদ্দশ জাস্টিনিয়ান-১
শতব্দীর একজন কাহিনীকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "এই ভয়ানক ঘটনার সত্য বিবরণ মানুষের জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করাই অসম্ভব।এটা বলা যায় যে, এই ভয়াবহ ঘটনা যে দেখেনি তাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত বলা যায়।সংক্রমিত ব্যক্তির বাহুমূল এবং কুঁচকি অস্বাভাবিক ফুলে যায় এবং কথা বলতে বলতেই ধপ করে পড়ে মৃত্যু লাভ করতে থাকে। মৃতের সংখ্যাধিক্যের কারনে তাদেরকে গণকবরে দাফন করা হয়।

ফ্লোরেন্স নগরীর জিয়োভানি বোকাচ্চিও'র বর্ণনায়," মৃতদেহ সৎকারের জন্য নুন্যতম শ্রদ্ধাটুকু দেখানো হয় নি যেটা কি-না একটি মৃত ছাগলের জন্যও প্রাপ্য হত পারতো"।কেউ কেউ মৃতদেহ বাড়ীতে লুকিয়ে রাখতো। অনেকেই সংক্রমণের ভয়কে মানসিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বোকাচ্চিও'র ভাষায়, "পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষ অতিরিক্ত মদ্যপান করতে থাকে, নাচে-গানে মত্ত হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় সুখ এবং আনন্দ উপভোগ করাতেই নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকে।সংক্রমণ ও মহামারীর বিষয়টি তারা ঘাড় থেকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলতো চাইতো যেন সেটা একটা বিশাল কৌতুক ছাড়া আর কিছু না"।

ক্রমে বিউবোনিক প্লেগে সংক্রমণের হার কমে আসলে বিউবোনিক প্লেগ বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৮৫৫ সনে আবার চীনে বিউবোনিক প্লেগ দ্বারা সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় যা ক্রমেই পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তখন শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই এই প্লেগের সংক্রমণের ফলে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এই প্লেগের সংক্রমণ রোধকল্পে সংক্রমিত অধিবাসী সহকারে এক একটি পাড়া-মহল্লা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ফ্র্যাঙ্ক স্নোডেন উল্লেখ করেছেন যে, "এতে করে যে সত্যি কোন উপকার হয়েছে কেউ তার প্রমাণ দিতে পারেনি"।

১৯১৪ সনে নিউ অরলিয়েন্সে ইঁদুর ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা।

ড. স্নোডেন লেখেন যে, এটা ঠিক স্পষ্ট নয় যে কী কারনে বিউবোনিক প্লেগ কমে আসে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মতামত প্রদান করেছেন যে শীতল আবহাওয়ায় প্লেগের জীবানু বহনকারী মাছিদের মৃত্যু ঘটার কারনে এটা হতে পারে। কিন্তু, দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে- ইঁদুর এবং মানুষ একই বাতাসে শ্বাস গ্রহন করলে শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমেও এই প্লেগের বিস্তার ঘটতে পারে।

অথবা, হয়তো এটা ইঁদুর প্রজাতির বিবর্তনের কারনেও হয়ে থাকতে পারে। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে তখন বিউবোনিক প্লেগের জীবানু বাদামী প্রজাতির ইঁদুরেরা বহন করছিল যারা জাহাজের ইদুরগুলো থেকে আরো শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর ছিল এবং যারা কি-না মানুষের সংস্পর্শ থেকে দুরেই বসবাস করতো।

"কোন ব্যক্তি হয়তো বাদামী ইঁদুর পোষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়"। ডাক্তার স্নোডেন মনে করে।

আর একটি অনুমান যে, বিবর্তনের ফলে 'ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস' জীবানুটি দূর্বল হয়ে পড়ে। অথবা মানুষ দ্বারা সংক্রমিত মানুষদের গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দেয়ার ফলে জীবানুটি ছড়িয়ে আর মহামারী আকার ধারণ করতে পারে নি।

তবে প্লেগ মানবসমাজ থেকে একেবারে চলে যায় নি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেইরি অঞ্চলের কুকুরদের মধ্যে এই জীবানুর প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং যেটা কুকুরের লালা থেকে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমেও মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তার স্নোডেন বলেন যে, তার এক বন্ধু নিউ মেক্সিকোর একটি হোটেলে থাকার পর প্লেগ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। বন্ধুটি থাকার পূর্বে হোটেলের ওই রুমটিতে বসবাসকারীর একটি কুকুর ছিল এবং সেই কুকুরটির শরীরের মাছিতে প্লেগের জীবানু ছিল।

এরকম ঘটনা এখন কদাচিৎ ঘটে এবং সংক্রমিত ব্যক্তিকে এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায়।কিন্তু তবুও প্লেগে সংক্রমিত হওয়ার খবরে এখনও দ্রুত মানুষের মনের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

একটি মহামারী যার বাস্তব সমাপ্তি ঘটে-

মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়া রোগসমুহের মধ্যে শুটি বসন্ত রোগটি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটেছে। এটা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এইজন্য যে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য একটি কার্যকরী টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, যে টিকা প্রয়োগে একজন ব্যক্তির শরীরে তার সম্পূর্ন জীবনের জন্যই এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

'ভ্যারিওলা মেজর' নামের এই ভাইরাসটি কোন পশু বা পাখির শরীরে পাওয়া যায় না সুতরাং মানুষের শরীর থেকে এই রোগ নির্মূল হওয়ার ফলে বলা যেতে পারে যে এই ভাইরাস সমস্ত পৃথিবী থেকেই নির্মূল করা হয়েছে।

বসন্ত টিকার প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্ভাবনকারী এডওয়ার্ড জেনার
১৭৯৬ সনে একটি শিশুকে টিকা দিচ্ছেন।

রোগটি ছোঁয়াচে হলেও যেহেতু শুটি বসন্তে শুঁটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগের প্রথম পর্যায়েই খুব সহজে চিহ্নিত করা যায় তাই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক ঘরে রেখে সহজেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

কিন্তু, তা হলেও যখন শুটি বসন্তের কোন টিকা ছিল না তখন এই মহামারী ছিল সত্যি খুব ভয়ঙ্কর। মহামারীর পর মহামারী প্রায় ৩০০০ বছর পৃথিবীতে ব্যপকভাবে ছড়িয়েছে। শুঁটি বসন্তে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথমে জ্বর হয় তারপর সারা শরীরে একপ্রকার শুঁটি হতে দেখা যায়, যা কি-না কিছুদিনের মধ্যেই পুঁজে ভরে উঠে এবং শরীরে শুঁটিগুলোর দাগ অবশিষ্ট রেখে একসময় সেটা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। শুঁটি বসন্তে আক্রান্তদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৩ জনেরই মৃত্যু ঘটেছে।

হার্ভার্ডের ইতিহাসবিদ ড. ডেভিড এস জোন্স লক্ষ্য করেন যে, ১৬৩৩ সনে আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া গুঁটি বসন্তের কারনে, " যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনজীবন বিপর্যস্ত হলে অবশ্যই সেই ঘটনা ম্যাসাচুসেটস-এ ইংরেজদের জন্য বসতি গড়ে তোলার অভিযান সফলতার মুখ দেখে"। প্লেমাউথ কলোনীর উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড রোগাক্রান্তদের বিষয়ে একটি বিবরণ লেখেন যে, পুঁজে ভরা ফুস্কুরিগুলো তাদের শুয়ে থাকা মাদুরে বস্তুত আঠার মতো লেগে থাকতো এবং মাদুর ছেড়ে উঠার সময় ঝরে পরতো। তিনি লেখেন, "সে অবস্থায় মনে হতো যেন গুটির স্থানে শরীরের চামড়া ছাড়ানো হয়েছে এবং সেখানে জমাট রক্ত লেগে থাকার কারনে সমস্ত শরীরের এক দূর্বিসহ দৃশ্য সৃষ্টি করেছে"।

১৯৭৭ সনে বিশ্বে প্রাকৃতিকভাবে গুঁটি বসন্তে আক্রান্ত সর্বশেষ ব্যক্তিটি ছিল সোমালিয়ার একজন পাচক, নাম আলী মাওয় মালিন। গুঁটি বসন্ত থেকে সেরে উঠলেও ২০১৩ সনে ম্যলেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল।

ভুলে যাওয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা সমুহ-

১৯১৮ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জার বৈশ্বিক মহামারীটিই উদাহরণ হিসেবে আজকের দিনের মহামারীর ধ্বংস এবং কোয়ারেন্টাইন অথবা সামাজিক দূরত্বের মুল্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ১৯১৮ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় পৃথিবীতে ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। এই ইনফ্লুয়েঞ্জায়র মরণ কামড়ে তরুণ থেকে মধ্যবয়সী অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মৃত্যুর ফলে অনেক সন্তান-সন্ততি অনাথ হয় এবং পরিবারের আয় উপার্জন কারী ব্যক্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়। তখন চলমান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যরাও এই ইনফ্লুয়েঞ্জার মরণ কামড় থেকে নিষ্কৃতি পায় নি।

১৯১৮ এর শরতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত সৈনিকদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য ড. ভিক্টর ভন'কে বস্টনের ক্যাম্প ডিভেন্স'এ পাঠানো হয়। তিনি দেখতে পান, "সৈনিকের পোষাক পরিহিত শত শত বলিষ্ঠ যুবকেরা সেখানকার হাসপাতালের ওয়ার্ডে ১০ অথবা ২০ জনের দল বেঁধে আসছিল। তাদেরকে একে একে হাসপাতালের বিছানায় স্থান দেয়ার পর সমস্ত হাসপাতাল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অথচ তখনো ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত সৈনিকদের আগমন থামছিলই না। তাদের চেহারাগুলো নীল হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের পীড়াদায়ক কাশির দমকে দমকে কফের সাথে রক্ত নির্গত হচ্ছিল। আর সকালে তাদের মৃতদেহ মর্গে কাঠের লগের মত স্তুপ করে রাখা হচ্ছিল"।

ড. ভিক্টর ভন আরো লেখেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রাণঘাতি ভাইরাসটি মানুষের তৈরি যে কোন মারণাস্ত্রের আবিষ্কারকে তুচ্ছ করে তুলেছিল"।

রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবীরা ১৯১৮ এর অক্টোবরে পিডমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়ায় মাস্ক তৈরির কাজে নিয়োজিত।
ছবি কৃতজ্ঞতা- এডওয়ার্ড রজার্স।

এই ইনফ্লুয়েঞ্জাটি সারা পৃথিবীতে ব্যপক মৃত্যুর স্বাক্ষর রাখার পর ক্রমেই বিলীন হয়ে বিবর্তিত মৌসুমী ফ্লু'এর রূপ নেয়, যে ফ্লু দ্বারা বিশ্বের দেশে দেশে মানুষ প্রতিবছর আক্রান্ত হলেও মৃত্যুর ঘটনা অনেক কমে যায়।

ডাক্তার স্নোডেন বলেন, "হয়তো এটা আগুনের মতোই ছিল। সহজ প্রাপ্য জ্বালানী নিধনের পর এটা নিজে নিজেই পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল"।

সামাজিকভাবেও ১৯১৮'এর ইনফ্লূয়েঞ্জা বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি ঘটে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং মানুষ নতুন ভাবে সবকিছু আরম্ভ করে নতুন অধ্যায় সুচনা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মানুষ যুদ্ধ এবং মহামারীর দুঃস্বপ্নকে পিছনে ফেলে আসতে উৎসাহী ছিল। সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী, ১৯১৮ এর ফেলে আসা অতীত স্মৃতিকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে।

১৯১৮এর ৫০ বছর পর ১৯৬৮ সনে ফ্লু'এর আর একটি মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু সেটা ১৯১৮এর ইনফ্লুয়েঞ্জার বৈশ্বিক মহামারীর মতো ততটা ভয়ঙ্কর ছিল না। ১৯৬৮এর ফ্লু যেটা কি-না হংকং ফ্লু নামেই অধিক পরিচিত, এই ফ্লু'এর সংক্রমণে সারা পৃথিবীতে মোট ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় যাদের সকলেরই বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল। এই ফ্লু ভাইরাসটি এখনও মৌসুমী ফ্লু'এর মতো মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে দেখা যায় কিন্তু এর সংক্রমণের সাথে বর্তমানকালে জড়িত ব্যক্তিগন এই ফ্লু'এর অতীত মহামারীকেলের বিদ্ধস্ততা এবং ভয়ের স্মৃতি কদাচিৎ স্মরণ করে।

কীভাবে কোভিড-১৯ এর সমাপ্তি ঘটবে?

কোভিড-১৯ মহামারীর বিষয়ে কী ঘটতে যাচ্ছে?

একটি সম্ভাবনার কথা, ইতিহাসবিদেরা বলেন যে, করোনা ভাইরাসের সমাপ্তি চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে শেষ হওয়ার পূর্বে সামাজিকভাবেই ঘটবে। বাধা-নিষেধ এর উপর ক্লান্ত হয়ে মানুষ মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা

করবে। যদিও তখনো করোনা ভাইরাস'এর সংক্রমণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সক্রিয় থাকবে এবং যদিও তখনো কোন টিকা অথবা কার্যকরী কোন চিকিৎসাব্যবস্থা আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ নাওমি রজার্স বলেন যে, "আমার মনে হয় এক্ষেত্রে ক্লান্তি ও হতাশার একটি সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিষয় কার্যকরী হতে পারে। আমরা হয়তো এমন একটা পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে যাবো যখন মানুষ বলবে- যথেষ্ট হয়েছে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াটাই আমার প্রাপ্য"।

এটা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে ঘটছে। রাজ্যের গভর্নর'রা কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ উত্তোলন করেছে। চুল কাটার সেলুন, নখ কাটার সেলুন এবং শরীর চর্চা কেন্দ্র খুলে দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য অধিকর্তারা বলছেন যে এ-ধরনের পদক্ষেপ অকালপক্ক। লকডাউনের কারনে যখন অর্থনীতিতে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে তখন বেশী বেশী করে মানুষ "যথেষ্ট" শব্দটি উচ্চারণ করতে প্রস্তুত হতে পারে।

"ইতিমধ্যেই সমাজে এরকম একটি দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে", ডাক্তার রজার্স বলেন। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি দেখতে চাইছেন কিন্তু জনগণের একটি অংশ ইতিমধ্যেই এই মহামারীর সামাজিক সমাপ্তি দেখতে চাইছেন।

"প্রকৃতপক্ষে এখনকার পর্যায়ে কে এই মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণার দায়িত্ব গ্রহন করতে পারে?", ডাক্তার রজার্স বলেন। "যদি কেউ করোনা বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণার ধারনাটি নিয়ে চাপাচাপি করে, তাহলে আসলে তারা কী নিয়ে চাপাচাপি করছে? যখন তারা বলছে, 'না এটার সমাপ্তি ঘটছে না।' আসলে, তারা tokhon কি দাবী করছে?

'চ্যালেঞ্জ এটাই', ডাক্তার ব্রান্ড বলেন যে, "কোন হঠাৎ বিজয়ের সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবতে পারি না"। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি নির্ধারন, "একটি সময়স্বাপেক্ষ এবং কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হবে"।

(তথ্য সুত্র- নিউ ইয়র্ক টাইমস)

Published May 10, 2020Updated May 14, 2020 New York Times

Gina Kolata

Gina Kolata is a reporter at The Times, focusing on science and medicine. Her training is in science: She studied molecular biology on the graduate level at M.I.T. for a year and a half and has a master's degree in applied mathematics from the University of Maryland.

Her work at The Times has led her to be a Pulitzer finalist twice — for investigative reporting in 2000 and for explanatory journalism in 2010. Other writing awards include ones in 2010 from the Silurian Society for a series on the war on cancer and from The Associated Press Sports Editors for writing about the Caster Semenya intersex controversy at the world track championships.

In previous years she has received awards from other groups, including the American Association of Health Care Journalists, and the University of Maryland, which gave her a Distinguished Alumnus award. Bowdoin College awarded her an honorary doctoral degree. And she was made a Kentucky Colonel, just like Col. Sanders.

She is the author of six books, the most recent of which is "Mercies in Disguise: A Story of Hope, a Family's Genetic Destiny, and The Science That Saved Them."

She has also lectured at various universities and medical schools.

Besides working for The Times, her passions include spending time with her family, reading literary fiction, distance running, road cycling, cooking and knitting.

আবু মোহম্মদ ইউসুফ

লেখক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক।

বক্তৃতার অনুবাদ

করোনার চেয়ে ভয়ংকর বিপদের কথা জানালেন চমস্কি

[অনুবাদকের নাম জানা সম্ভব হয়নি]

যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাবিদ ও রাজনীতি বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কি করোনাভাইরাস পরবর্তী পৃথিবীতে এর চেয়ে ‘ভয়ংকর’ বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় এক টেলিভিশনকে সোমবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৯১ বছর বয়সী এ বুদ্ধিজীবী করোনাভাইরাস পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘করোনাভাইরাস নিজেই অনেক বড় এক ভয়ের কারণ, কিন্তু ভবিষ্যতে আরো বড় দুই বিপদ এগিয়ে আসতে পারে আমাদের দিকে, যা হবে মানব ইতিহাসে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা: যার একটি হলো পরমাণু যুদ্ধ আর অপরটি হচ্ছে চলমান বৈশ্বিক উষ্ণায়নের হুমকি। করোনাভাইরাস দুঃস্বপ্নের মতো এবং একে ভয় পাওয়ার অনেক কারণও আছে, কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণ যাওয়া যাবে। তবে কিছু বিষয় থেকে আর মুক্তি পাওয়া যাবে না, এগুলো একেবারেই শেষ’।

নোয়াম চমস্কি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি অনেক বড়। এটি একমাত্র দেশ যখন ইরান বা কিউবার ওপর অবরোধ দেয় তখন অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। ইউরোপও তার গুরুকে অনুসরণ করে। এসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কারণে অনেক ভুগেছে’।

তবে করোনাভাইরাসের সংকটের সময় কিউবার কথা উল্লেখ করে চমস্কি বলেন, ‘কিন্তু তারপরও এ সময়ের সবচেয়ে বিদ্রূপাত্মক ঘটনা হলো কিউবা ইউরোপকে সাহায্য করছে। জার্মানি গ্রিসকে সাহায্য করতে পারছে না, কিন্তু কিউবা ইউরোপীয় দেশকে সাহায্য করছে’।

ভূমধ্যসাগরে হাজারো অভিবাসন প্রত্যাশী ও শরণার্থীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চমস্কি বলেন, এসব দিক দিয়ে পশ্চিম ধ্বংসাত্মক অবস্থানে আছে।

তিনি বলেন, ‘করোনাভাইরাসের সংকটের সময় মানুষের মধ্যে এ ভাবনার জন্ম হতে পারে যে তারা কী ধরনের পৃথিবী চায়।

চমস্কি এই সংকট পরবর্তী সময়ে বিশ্বের ধনী দেশগুলোকে অন্যান্য দেশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ দিন ধরেই আমরা জানি যে পৃথিবীতে মহামারি কিছুদিন পর পর আসে, এবং এ বিষয়ে খুব ভালো বোঝাপড়াই ছিল যে, সার্স এর পরিবর্তিত রূপ হিসেবে করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তারা এ জন্য ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করতে পারত, করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় কার্যকর উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিতে পারত, এবং সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজেই আজ আমাদের হাতে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন থাকতে পারত’।

বড় বড় ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো ভ্যাকসিন উৎপাদনের তুলনায় শরীরের জন্য ক্রিম উৎপাদন বেশি লাভজনক। পোলিও সমস্যার সমাপ্তি ঘটেছিল ‘সালক’ ভ্যাকসিন এর মাধ্যমে যা সরকারি পর্যায়ে আবিষ্কার করা হয়েছিল, এর কোনো পেটেন্ট ছিল না। এ সময়েও এটা করা যেত, কিন্তু নয়া উদারবাদী প্লেগ তা হতে দিল না’।

চমস্কি বলেন, ‘২০১৯ সালের অক্টোবরে বিশ্বব্যাপী এ ধরনের এক মহামারি ছড়িয়ে পড়ার তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ছিল, কিন্তু কিছুই করা হয়নি। এ তথ্যের দিকে আমাদের নজর যায়নি। ৩১ ডিসেম্বর চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে বলল যে, একটি নিউমোনিয়া দেখা দিয়েছে এর এক সপ্তাহ পর কিছু চীনা বিজ্ঞানী জানাল যে এটা হলো করোনাভাইরাস এবং তারা এ তথ্য পৃথিবীকে জানাল’।

তিনি আরো বলেন, ‘যখন আমরা কোনোভাবে এ সংকট উতরে যাব, তখন আমাদের সামনে হয় খুব ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্ববাদী হিংস্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বেছে নিতে হবে অথবা আমরা পাব সমাজের যৌক্তিক পরিবর্তন ঘটবে, মানবিক প্রয়োজন ও দয়াবান এক সমাজ তৈরি হবে যেখানে ব্যক্তিগত লাভের তুলনায় সামষ্টিক মানুষের প্রয়োজন গুরুত্ব পাবে’।

তিনি বলেন, ‘এখানে সম্ভাবনা আছে মানুষ সংগঠিত হবে, পরস্পর সংযুক্ত হবে, সবাই মিলে আরো ভালো এক পৃথিবী সাজাবে, যা একের পর এক সংকট মোকাবিলা করে, যা আমরা এখন মোকাবিলা করছি। (সেই সমাজ) পরমাণু যুদ্ধ, যা অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় আরো অনিবার্য হয়ে পড়েছে, আর রয়েছে অলঙ্ঘনীয় পরিবেশ বিপর্যয় যার কোনো সমাধান নেই, যা আমাদের একেবারে নিকটে- এসব বিষয়ে কোনো কার্যকর সিদ্ধান্তে আসতে পারবে’।

তিনি বলেন, ‘সুতরাং এ সময়টি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শুধু করোনাভাইরাসের জন্যই নয়, এই পরিস্থিতি বরং আমাদের পৃথিবীর ভুলগুলো বুঝতে সহায়ক হবে, অকার্যকর আর্থসামাজিক ব্যবস্থার গভীরে তাকানোর সুযোগ দেবে, যার পরিবর্তন আবশ্যক, যদি আমরা চাই একটি বাসযোগ্য পৃথিবী’।

[সংগ্রহ: দেশ রূপান্তর: অনলাইন ডেস্ক | বুধবার, ১৮ চৈত্র ১৪২৬, ০১ এপ্রিল ২০২০]

--

চিঠি

ইতালীর ঔপন্যাসিক #ফ্রান্সেশকা_মেলান্দ্রি, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে রোমে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী অবস্থায় বাকী পৃথিবীর প্রতি একটি চিঠি লিখেছেন।

চিঠির নাম:
"তাঁদের ভবিষ্যত থেকে"
আমি ইতালি থেকে বলছি

"এ চিঠি পৃথিবীর সংকাটকাল অতিক্রমের এক আশ্চর্য ছবি হয়ে উঠেছে। কথা বলেছে মৃত্যুর গভীর ছায়ার নিচে বসে পৃথিবীতে এখনো নিরাপদ অথচ আশংকায় টালমাটাল মানুষদের সঙ্গে। এই চিঠি বলতে চেয়েছে সামনের সময়ে কেমন অবয়ব ধারণ করবে আমাদের প্রিয় পৃথিবী।

আমি ইতালী থেকে লিখছি মানে তোমাদের ভবিষ্যৎ থেকে লিখছি এই চিঠি। আমরা এখন সেই বর্তমানে যেখানে কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা পদার্পন করবে। মহামারীর এই ভয়াল আবর্তে আমরা সবাই চক্রাকারে ঘুরছি।

সময়ের পথ-পরিক্রমায় আমরা তোমাদের থেকে শুধু কয়েক ধাপ এগিয়ে, যেমনটা উহান ছিলো আমাদের সামনে। আমরা যেমনটা করেছিলাম ঠিক একই আচরণ এখন তোমরা করছো। যারা এখনো বলছে ‘এটা শুধুই সর্দি-কাশি, এতো তর্কের কী আছে?’ আর যারা এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে – এই দুই দলে ভাগ হয়ে একই তর্ক আমরাও করেছিএইতো ক’দিন আগেই।

এই যে এখন আমরা ইতালী থেকে – তোমাদের ভবিষ্যৎ থেকে- তোমাদের দেখছি, আমরা জানি যখন তোমাদের গৃহান্তরীণ হতে বলা হয়েছিলো,অনেকেই তোমরা জর্জ অরওয়েলকে উদ্ধৃত করেছ, কেউ কেউ হবসকেও। কিন্তু খুব শীগগির তোমরা তাও করতে পারবে না।

প্রথম প্রথম, তোমাদের খাওয়া দাওয়া বেড়ে যাবে । এজন্য নয় যে, খাওয়াটা অন্তিম সময়ের মহার্ঘ্য জিনিসের একটা যা তোমরা করতে পারো।

অবসর সময়টাকে কিভাবে ফলপ্রসু করা যায়, তার জন্য বহু টিউটোরিয়াল খুঁজে বের করবে সামাজিক যোগাযোগের গ্রুপগুলোতে। তার সবগুলোতে নাম লেখাবে,

আর তারকিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবে।

বইয়ের তাক থেকে মহাপ্রলয়ের বই বের করবে, কিন্তু পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে অচিরেই।তারপর আবার খাওয়াদাওয়ায় মনোযোগী হবে। ঘুম হবে না ভালো। নিজেদের প্রশ্ন করবে, গণতন্ত্র কোন চুলোয় যাচ্ছে?

অন্তর্জালে এক বিরামহীন সামাজিক জীবন শুরু হবে তোমাদের – মেসেঞ্জার, ওয়াটস্যাপ, স্কাইপ, জুম…

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জন্য তোমাদের এমন কষ্ট হবে যেমনটা আর কখনো হয় নি; তাদের আর কখনো দেখতে পাবে কি না এই শংকা ঢেউ হয়ে বুকে আছড়ে পড়বে।

অতীতের আফসোস আর মন কষাকষিগুলো তখন মামুলি মনে হবে। জীবনে যাদের মুখ আর দ্বিতীয়বার দেখবে না বলে ভেবেছিলে তাদের ফোন করে জিজ্ঞেস করবে, ‘কেমন আছ?’ অনেক নারী গৃহনির্যাতনের শিকার হবে।

তোমরা ভাবতে শুরু করবে, যাদের ঘর নেই তারা কেমন করে ঘরে থাকবে? খাঁ খাঁ

করা রাস্তা দিয়ে দোকানে যেতে তোমার ভয় করবে, বিশেষ করে যদি মেয়ে হও। নিজেদের জিজ্ঞেস করবে, এভাবেই কি সভ্যতা ধবংস হয়? এমন তড়িৎবেগে?

তারপর এইসব ভাবনাগুলোকে জোরে সরিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে আবার খাওয়াদাওয়ায় স্বস্তি খুঁজে নেবে।

তোমাদের ওজন বাড়বে। অন্তর্জালে ফিটনেস ট্রেনিং এর ক্লাশ খুঁজে বেড়াবে।

তোমরা হাসবে। মাতালের মতো হাসতেই থাকবে। সবকিছুতে এমন রস খুঁজে পাবে যা আগে কখনো ভাবতেই পারতে না। সবকিছুই অত্যধিক সিরিয়াসভাবে নেয়া লোকেরও মনে হতে থাকবে এই জীবন, এই মহাবিশ্বের সমস্তকিছু অসাড়, অর্থহীন।

কাঁচাবাজারের লম্বা লাইনে তোমরা বন্ধু আর প্রিয়জনদের শুধুমাত্র একটু চোখের দেখা দেখার জন্য আলাদা করে সময় নির্ধারণ করবে, সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে।

কী কী জিনিসের তোমাদের দরকার নেই তা একসময় বসে গুনবে।

আশেপাশের মানুষের সত্যিকারের চেহারা বড় স্পষ্টভাবে বের হয়ে পড়বে। যা আগে থেকেই ধারণা করেছিলে তা নিশ্চিত হবে, আশ্চর্যও কম হবে না।

খবরে রোজ দেখা বিদগ্ধজনেরা অদৃশ্য হতে থাকবেন, তাদের মতামতকে হঠাৎ করেই অবান্তর মনে হবে, কেউ কেউ এমন সব অমানবিক যুক্তি-তর্ক সাজাবেন যে লোকে তাদের কথায় আর কান দেবে না। যাদেরকে অবজ্ঞা করেছ তারাই দেখা দেবে দয়ালু, নির্ভরযোগ্য, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন আর চক্ষুষ্মান হয়ে।

এই বিপুল জগাখিচুড়িকে নতুন বিশ্ব গড়ার সুযোগ হিসেবে দেখার নিমন্ত্রণ হয় তো সবকিছুকে এক বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রেরণা যোগাবে। একইসঙ্গে এইসবই তোমাকে চরমভাবে বিরক্তও করবে। কার্বন ডাই অক্সাইড কমে গিয়ে ধরিত্রী আরাম করেশ্বাস নিচ্ছে, সেখুব ভালো কথা, কিন্তু সামনের মাসের বিল পরিশোধ হবে কেমন করে!

তুমি বুঝতে পারবে না এই বিপর্যয়কাল শেষে নতুন পৃথিবীর জন্ম কি সুবিপুল আড়ম্বরপূর্ণ? নাকি এক শোচনীয় বিষয়?

তুমি তোমার জানালা থেকে বা সামনের লন থেকে গান বাজাবে। আমরা যখন আমাদের বারান্দা থেকে অপেরা গাইছিলাম, তোমরা ভাবছিলে, "ওহ, হুজুগে ইতালীয়গুলো!" আমরা জানি, তোমরাও এক অপরকে চাঙ্গা করার জন্য গান গাইবে। আর তারপর যখন তোমাদের জানালা থেকে 'আই উইল সারভাইভ' গাইবে, আমরা দেখবো আর মাথা নাড়বো যেমনটা করেছিলো উহানবাসী, যারা ফেব্রুয়ারীতে তাদের জানলা থেকে এই গান গেয়েছিলো, মাথা নাড়িয়ে, আমাদের দিকে চোখ রেখে।

অবরুদ্ধ সময়ের শেষে প্রথম কাজ হবে তালাকের দরখাস্ত করা, এই পণ করে তোমাদের অনেকে রাতে ঘুমুতে যাবে।অনেকে সন্তানসম্ভবা হবে।

তোমাদের সন্তানদের স্কুলের পড়াশোনা হবে অন্তর্জালে। তারা তোমার জীবন বিষময় করে দেবে, আবার তারাই আনন্দের উপলক্ষ এনে দেবে।

বুড়োরা হতচ্ছাড়া কিশোরদের মতো কোন কথাই মানতে চাইবে না। বাইরে বেরিয়ে, ভাইরাসের জ্বর বাঁধিয়ে যেন মরে না যায় তার জন্য তোমাদের রীতিমতো যুদ্ধ করতে হবে।

নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে একাকী যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে, তাদের ভাবনা থেকে তোমরা নিজেদের মনকে সরিয়ে রাখতে চাইবে।

সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের পায়ে চলা পথকে তুমি গোলাপের পাঁপড়িতে ভরিয়ে দিতে চাইবে।

তোমাদের বলা হবে, সমস্ত সমাজ এক যুথবদ্ধ প্রচেষ্টায় একীভূত, তোমরা সবাই একই নৌকোর যাত্রী। এটা সত্যি। বিপুলা এক পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে তুমি নিজেকে যেভাবে দেখতে, এই অভিজ্ঞতা সেই দেখার চোখকে চিরতরে বদলে দেবে।

সমাজের কোন শ্রেণিতে তোমার অবস্থান তা অনেক কিছুই নির্ধারণ করবে। সুন্দর বাগানঘেরা বাড়ীতে বন্দী থাকা আর জনাকীর্ণ আবাসনে আটকে পড়া এক জিনিস নয়। ঘরে থেকে কাজ করার সুযোগ পাওয়া আর তার অভাবে চাকরি চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও এক নয়। সেই নৌকো যাতে সগর্বে এই মহামারীর মোকাবেলা করবে বলে সওয়ার হলে, তা সবার কাছে এক রকম দেখাবে না, এক রকম তা নয়ও, কখনো ছিলো না।

তারপর এক সময় তুমি বুঝতে পারবে এই যাত্রা কঠিন। তুমি ভয় পাবে। তুমি প্রিয়জনের সঙ্গে তোমার ভয়ের কথা বলবে, অথবা বলবে না। এই ভয়ের ভারে তারাও ন্যুব্জ হোক, চাও না বলে।

তুমি আবারও আহারেই শান্তি খুঁজে নেবে।

আমরা এখন ইতালীতে এবং এই হলো তোমাদের ভবিষ্যৎ চিত্র। এটা খুব ছোট মাপের ভবিষ্যৎবাণী। আমরা খুব ছোট চোখে দেখি কি না!

যদি আমরা দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, যে ভবিষ্যৎ আমাদের উভয়ের কাছে অজানা, আমরা তোমাদেরকে শুধু এটুকু বলতে পারি, এই সবকিছুর শেষটা যখন আসবে-

এই পৃথিবীটা একই রকম থাকবে না।"

--

অনুবাদ: ড:মাতলুবা খান মিশুক, প্রভাষক, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়।

(সংগ্রহ: সাঈদা সুলতানা এ্যানির ফেইসবুক ওয়াল থেকে)